প্রণাম

বিশিষ্ট সংগীতগুরু **ননীগোপাল চক্রবর্তী,**
বিশিষ্ট বেহালাশিল্পী **ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক,**
লেখক, জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক **ডা. নীলমণি দেববর্মণ,**
আলোকচিত্র শিল্পী, সাংবাদিক, লেখক **রবীন সেনগুপ্ত,**
কবি, লেখক **শ্যামলাল দেববর্মা,**
কবি, বিশিষ্ট সমাজকর্মী **করবী দেববর্মণ**

যাঁরা হৃদয়ের আলোয় ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনকে আলোকময় করে গেছেন।

ভাষাসাহিত্য
১৪ বর্ষ। সংখ্যা ২৩। এপ্রিল ২০১৭।

BHASASAHITYA
14th Year : 23rd Issue, April 2017
[a literery and cultural preface of Bhasa Trust]

প্রধান সম্পাদক ঃ কল্যাণব্রত চক্রবর্তী
সম্পাদক ঃ কৃত্তিবাস চক্রবর্তী।

প্রচ্ছদ ঃ বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

অক্ষর বিন্যাস ইনফোপ্রিন্ট, নতুন পল্লী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-৭৯৯০০১।
মুদ্রণ কুইক্ প্রিন্ট, আগরতলা।
প্রকাশক কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, ভাষা ট্রাস্ট, 'শান্তি কুটির',
নতুন পল্লী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-৭৯৯০০১ থেকে।
দূরভাষ ০৩৮১-২৩৭০১৭৭। ০৯৪৩৬৪৬০৯৩৩।

Chief Editor : Kalyanbrata Chakraborti.
Editor : Krittibas Chakraborty.

Cover Design : Bimalendra Chakraborty.

Communication :
Care : *Santi Kutir*, Nutanpally, Krishnanagar,
Agartala-799001, Tripura, India.
Phone : 91-9436460933 / 91-0381-2370177
e-mail : bhasatripura@rediffmail.com

মূল্য ঃ ১০০ টাকা।
Rs. 100/-

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৪-৭
বিশেষ গদ্য ৮-১৩
জয়ন্ত মহাপাত্র। কবিতায় মুক্তি ঃ একটি দরজা
অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

কবিতা ১৪-৭৫

পঙ্কজ বণিক, পায়েল দেব, চিরশ্রী দেবনাথ, নীপবীথি ভৌমিক, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, মৃণালকান্তি দেবনাথ, অনিরুদ্ধ সাহা, দেবাশিস ভট্টাচার্য, তন্ময় দেবনাথ, শরাফত হোসেন, তুষ্টি ভট্টাচার্য, মুজিব ইরম, অরিত্র দে, মৌ সেন, দেবপ্রতিম দেব, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, দেবপ্রতিম দেব, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, সদানন্দ সিংহ, অশোকানন্দ রায়বর্ধন, শর্মিষ্ঠা পাল, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, সন্তোষ রায়, দিলীপ দাস, লক্ষ্মণ বণিক, শুভেশ চৌধুরী, মাধব বণিক, অলক দাশগুপ্ত, শক্তি দত্তরায়, নকুল রায়, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী।

গদ্য ৭৬-৮০
মুহম্মদ নূরুল হুদা। কবিতার অনুবাদ ঃ মুক্ততা ও মৌলিকতা

সমকালীন ভারতীয় কবিতা। ৮১-১১৪

জয়ন্ত পারমার, কুমারন, থানজাভুর কবিরায়ার, পি অজিত কুমার, য়ুমলেম্বন ইবমচা সিংহ, আরামবাম ওংবী মেমচৌবি, সুরজিৎ পাটার, সুচেতা মিশ্র, রবীন্দ্র কে সোয়াইন, শুভশ্রী লেঙ্কা, কমল ভোরা, এন গোপী, প্রকাশ ডি পদ্‌গাঁওকার, এস জি সিদ্ধারামাইয়া, সজল দে, কৌস্তভমণি সইকিয়া।

অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে

বিশিষ্ট লেখক ও ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহকে 'মহাকালের শাস্তি' দেবার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীরা। শ্রী গুহ সম্প্রতি এক লেখায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বি-জে-পি সভাপতি অমিত শাহ্‌র সমালোচনা করেছিলেন, এই তাঁর 'অপরাধ'। দুষ্কৃতকারীরা ই-মেলে শ্রী গুহকে জানিয়েছে, 'মোদী এবং অমিত শাহ্‌ মহাকালের আশীর্বাদ পেয়েছেন। দুনিয়াকে বদলে দেবার জন্য মহাকাল তাঁদের শক্তি দিয়েছেন, নির্বাচিত করেছেন। তাঁদের সমালোচনা করে মহাপাপ করেছেন আপনি। চরম শাস্তির জন্য এখন প্রস্তুত হোন।' এসব হুমকি দেওয়া মেল কারা পাঠাচ্ছে তাদের নাম প্রকাশ করেননি রামচন্দ্র গুহ। এই নিয়ে পুলিশের কাছেও কোনো অভিযোগ জানাননি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের এক শীর্ষ বিজেপি নেতা বলেছেন, 'অমর্ত্য সেনের নোবেল পাওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই নেই। অপদার্থ, মেরুদণ্ডহীন, তোষামোদপ্রিয় এই মানুষটি অর্থনীতির কিছুই বোঝেন না।' এনিয়ে অমর্ত্য সেন কোনো মন্তব্যই করতে চাননি। বলেছেন, ভদ্রলোক যা বুঝেছেন বলেছেন। আমার মন্তব্য করার কিছু নেই। নিজের ফেসবুক-এ তাঁর লেখা 'অভিশাপ' কবিতাটি পোস্ট করার জন্য কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট কবি শ্রীজাতকে খুনের হুমকি দিয়েছে হিন্দু অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য, কলেজ পড়ুয়া এক অর্ণব সরকার। এই কবিতায় নাকি হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। কবি শ্রীজাত বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী কলকাতা পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁদের টেলিফোনে, ই-মেলে ক্রমাগত খুনের হুমকি দেয়া হচ্ছে। প্রাণহানির আশঙ্কায় শ্রীজাতর পর কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হলেন একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট কবি মন্দাক্রান্তা সেন। নিজের ফেসবুক ওয়ালে একটি কবিতা পোস্ট করেছিলেন প্রতিবাদী কবি মন্দাক্রান্তা। এ কবিতা পড়েও নাকি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত পেয়েছে কোনো এক রাজা দাশ। রাজা ফেসবুক-এ কবিকে গণধর্ষণের হুমকি দিয়েছে। খুন করার হুমকিও দিয়েছে। মন্দাক্রান্তা কলকাতায় লালবাজারে গিয়ে সাইবার থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

একজন কবি বা লেখকের নিজস্ব মতামত লেখায় প্রকাশ করার নিরঙ্কুশ অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো জায়গা নেই। কোনো কবি বা লেখকের লেখা বা তাঁর লেখায় প্রকাশিত মতামত একজন পাঠকের পছন্দ না-ও হতে পারে। পাঠক তাঁর প্রতিবাদ, মন্তব্য বা অভিমত লিখিতভাবে জানাতে পারেন, সে অধিকার অবশ্যই তাঁর রয়েছে। তার পরিবর্তে কবিকে বা লেখককে এমন কুৎসিত, অভব্য ভাষায় আক্রমণ, খুন-ধর্ষণের প্রকাশ্য হুমকি যে কোনো দেশের গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিণামের ইঙ্গিত দেয়। এভাবে যারা হুমকি দেয়, দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া খুবই জরুরি। কিন্তু পরিতাপের কথা, আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক শক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দুষ্কৃতকারীদের প্রকাশ্যে মদত দিয়ে চলেছে, আর এরই পরিণামে দেশের বিভিন্ন অংশে পক্ষপাতহীনভাবে মুক্ত চিন্তা যাঁরা করেন, সে সমস্ত কবি, লেখক, ঐতিহাসিকদের বেছে বেছে খুন করা হচ্ছে প্রফেশনাল কিলারদের কাজে লাগিয়ে। মানুষের মুক্ত চিন্তাভাবনার ওপর ওরা পাথর চাপিয়ে দিতে চাইছে, ভয়, আতঙ্ক ছড়িয়ে মানুষের মুখের ভাষা স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। এ সমস্ত নগ্ন ফ্যাসিবাদী প্রবণতারই লক্ষণ। এসব করা হচ্ছে কখনো ধর্মের নামে, আবার কোথাও উগ্র হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে। প্রতিবেশী বাংলাদেশে একইরকমভাবে মুক্ত চিন্তার নেতৃত্বকে সরিয়ে দিতে প্রকাশ্যে বেছে বেছে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে।

ঐতিহাসিক পরম্পরায় ভারত নানা জাতিগোষ্ঠী, বহুধর্ম, বিচিত্র সংস্কৃতি, রকমারি জীবনধারার সংগমস্থল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারততীর্থ। বিবিধের মাঝে এক অপরাজেয় প্রাণশক্তির মৈত্রীবন্ধন। এটিই ভারত-জীবনের ঐকান্তিক ভবিতব্য। বহুর মধ্যে এই একতাকে যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বিপন্ন করতে চাইছে,তারা ইতিহাসের অভিপ্রায়কে অন্ধকারে ঢেকে দিতে চায়।

—কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

প্রাদেশিক ভাষাসাহিত্যের সেতুবন্ধনে

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সেতুবন্ধনের কাজটি যদিও অনেকদিন ধরেই সাহিত্য অকাদেমি ও ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট করে আসছে অনুবাদ ও সারা দেশে বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে, তবুও আমাদের মধ্যে এতদিনে যে শক্ত সেতু নির্মিত হওয়ার কথা ছিল তা কি হলো? বোধহয় না। এটা আশ্চর্য এবং বিষণ্ণতারও যে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে আজও আমাদের যোগ তেমন নিবিড় ও নিয়মিত নয়। ব্যতিক্রম থাকলেও, অনেকেই আমরা এই মুহূর্তে কন্নড়, মালয়ালম, তেলুগু, মারাঠা, কোঙ্কনি বা উত্তর-পূর্ব ও অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার সাম্প্রতিক তৎপরতা সম্পর্কে খুব কমই জানি। গত বছর শিলং-এ সাহিত্য অকাদেমির একটি অনুষ্ঠান 'অল ইন্ডিয়া পোয়েটস্ মিট'-এ যোগ দিয়ে একটা বিরল অভিজ্ঞতা হলো। বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে-সমস্ত কবিরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা প্রায় অনেকেই স্বনামধন্য, তাঁদের ব্যতিক্রমী চিন্তার সারাৎসার ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ তাঁদের দু-একজন ছাড়া বাকিদের লেখা এই প্রথম পড়ার সৌভাগ্য হলো! এ হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে আমার অক্ষমতা বা উদ্যোগের খামতি হতে পারে, কিন্তু অনেক কবিবন্ধুরই আমার মতো অভিজ্ঞতা। সেইদিক দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী আমন্ত্রিত কবিরাও আমাদের অর্থাৎ বাংলাভাষার লেখালেখি সম্পর্কে কোনো খোঁজখবরই রাখেন না। এমনটা বোধহয় কাঙ্ক্ষিত নয়।

এটা নিঃসন্দেহ যে কাজটা ভাষান্তরের মাধ্যমেই হতে পারে মূলত। এবং তা উভয় ভাষায়, উভয় পক্ষে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার লিটিল ম্যাগাজিন স্তরে কাজটি নিয়মিত হলে পরস্পর সংযোগ নিবিড় ও ব্যাপকতর হতে পারে। তাহলে বোধহয় অবস্থা এতটা করুণ হবে না। অন্য ভারতীয় ভাষায় যাঁরা ধ্রুপদী সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন সে তো অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাভাষার বাইরে অন্য ভাষায় একজন তরুণতম কবি বা কথাশিল্পী কী ভাবছেন, তার কতটুকু আমরা জানি? 'অনুবাদ পত্রিকা' বা 'ভাষাবন্ধন'-এর মতো কাগজের উদ্যোগ ছিল অসাধারণ। (কবি নবারুণ ভট্টাচার্য বা মহাশ্বেতা

দেবী লোকান্তরিত হবার পর 'ভাষাবন্ধন' প্রকাশের কেউ দায়িত্ব নিয়েছেন কিনা জানি না)। তাছাড়া বাংলাভাষায় বিভিন্ন কাগজে বিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ও, কিন্তু এটা দরকার নিয়মিতভাবেই। বিশেষ করে যোগাযোগ আরও নিবিড় হলে, যথাসম্ভব মূল থেকে অন্য ভাষায় অনুদিত হলে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের চিত্ররূপ উঠে আসবে। আমাদের ত্রিপুরায় 'মুখাবয়ব', 'জলজ', 'পূর্বমেঘ' মাঝেসাঝে মূল্যবান কিছু লেখার অনুবাদ করছে। 'মুখাবয়ব' পাঞ্জাবি গল্পসাহিত্যের ওপর একটি পূর্ণ সংখ্যাই করেছে। এটা নিয়মিত ভাবেই হওয়া উচিৎ বলে মনে হয়। 'ভাষাসাহিত্য'র পক্ষে আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি আগেই। কিন্তু এখন থেকে নিয়মিতভাবে শুধু লেখার অনুবাদ প্রকাশই নয়, সংশ্লিষ্ট লেখকদের সাথে যোগাযোগ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি দু-তরফেই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নিয়েছি। এব্যাপারে আমি অনুরোধ করবো আমাদের অন্যান্য সাহিত্যপত্রের সম্পাদক ও কবিবন্ধুরাও যেন তাঁদের কাগজে এই চেষ্টাটি নিয়মিত করেন।

—কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

জয়ন্ত মহাপাত্র

কবিতায় মুক্তি ঃ একটি দরজা

প্রতিটি হৃদয়ে একটি দরজা আছে, যা কখনোই খোলে না। অথবা, কখনো যদিবা খোলেও, আমরা জানতেই পারি না। যখন খোলে এই দরজা, সে আমাদের এক অন্য পৃথিবীর সন্ধান দেয়, যেখানে সময় তুচ্ছ হয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়তে থাকে মহাশূন্যতা, এবং আমাদের আত্মা যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যাপ্তিতে আর আলোর উদ্ভাসে। যখন কেউ কেবলমাত্র শিশু, আর তার চারপাশের পৃথিবীর অন্ধকার তার কাছে যখন বড়ো বেশি বাস্তব, হয়তো সে এক ঝলক সেই দরজা খোলার আভাস পায়, বাইরের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিহীনের মতো চেয়ে থাকে সে। শিশু অনুভব করে, এক অদৃশ্য আলো যেন তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এক অচেনা পৃথিবীতে, এক মুক্ত কল্পলোকে।

আমার ছোটোবেলায় সেরকমই একটি সহজ আনন্দের কথা মনে করতে পারি, যা আমাকে একটা নতুন প্রারম্ভের কথা বলেছিল বা আমার দিনগুলোকে যা একটা নতুন অর্থ দিয়েছিল। সেসময় আমি একটি বয়ে চলা ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতাম, আর আমার পা ছুঁয়ে বয়ে চলা স্রোতটাকে অনুভব করতাম, কিন্তু এটা শুধুমাত্র আমার পা ধুয়ে বয়ে যাওয়া জলের স্পর্শানুভূতির আনন্দই নয়, যার কথা আমি বলতে চাইছি, বোধহয় এটা আরো অন্যকিছু, এমন কিছু যার সম্বন্ধে তখন আমার চেতনা

জানতই না— এমন কিছু, যার শেকড় প্রোথিত হয়ে যেত আমি যা-কিছুই করতে চাইতাম তার মধ্যে, আর তারপর আমি যা করতাম, আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীটার কোনো তোয়াক্কা না করেই করতাম, ওই ঘাস, ওই মাটি, এবং বোধহয় আকাশের বুকে আনন্দে দোল খাওয়া ওই তারাগুলোর দিকেও আমার তখন কোনো হুঁশ থাকত না। অতীতের সেই সাধারণ মুহূর্তটির থেকে কী ধরে রেখেছি আমি? আমার মনে কেন তা জেগে আছে আজও? সেটা কী হতে পারে, আমার মনে কি বিন্দুমাত্র ধারণাও আছে? আমি নিশ্চিত নই, হয়তো আমি কিছুর সন্ধান করছি অথবা আমি কি সত্যিই চেষ্টা করছি সেই মুহূর্তটির থেকে বেরিয়ে আসতে?

বছরের পর বছর পার করে আজ আমি অনুধাবন করতে পারি যে সেই সহজ আনন্দ, যা আমাকে এক অদ্ভুত বিষণ্ণ, আলোকিত অনুভূতি এনে দিত, একই সঙ্গে সেটাই বোধহয় এমন কিছু, যাকে আমি 'মুক্তি' বলতে পারি। এবং এই মুক্তি জন্ম দেয় এক বিশ্বাসের, এক অবর্ণনীয় আলোক-উদ্ভাসের, যা কিনা একটি প্রদীপের থেকে ছড়িয়ে পড়া জ্যোতির মতো, যা সরে যাচ্ছে, যা-কিছু মানুষের জীবনের ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করতে অক্ষম, সে সমস্ত কিছুর থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমার কাছে একটা ভালো কবিতা বোধহয় ঠিক এই কাজটাই করে। এবং ভালো কবিতা তাকেই আমি বলব, যার শব্দে রয়েছে সেই আবেগ, আনন্দ যা দিয়ে প্রকৃত জীবনরসকে ছোঁয়া যায়। এবং উল্লেখ করার বিষয় হল যে কবিতা এটা পারে। সত্যিকারের কবিতার সেই ক্ষমতা রয়েছে যা কবি এবং পাঠক উভয়কেই দৈনন্দিনতার থেকে মুক্ত করে মনে এমন এক অনুভূতি এনে দিতে পারে, যা অসাধারণ। এই যে স্বাধীনতা বা মুক্তি কবিতা সৃষ্টি করতে পারে, তাকে কি আমরা কবিতার জাদু বলতে পারি?

লেখা ব্যাপারটা ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা। এটা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মহান সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, কে করল সেই মহান

ভালো কবিতা তাকেই আমি বলব, যার শব্দে রয়েছে সেই আবেগ, আনন্দ যা দিয়ে প্রকৃত জীবনরসকে ছোঁয়া যায়। এবং উল্লেখ করার বিষয় হল যে কবিতা এটা পারে। সত্যিকারের কবিতার সেই ক্ষমতা রয়েছে যা কবি এবং পাঠক উভয়কেই দৈনন্দিনতার থেকে মুক্ত করে মনে এমন এক অনুভূতি এনে দিতে পারে, যা অসাধারণ। এই যে স্বাধীনতা বা মুক্তি কবিতা সৃষ্টি করতে পারে, তাকে কি আমরা কবিতার জাদু বলতে পারি?

সৃষ্টি? টি এস এলিয়ট, শেক্সপীয়ার, দস্তয়েভ্স্কি— তাঁদের ছাড়া, তাঁদের লেখা বাদ দিলে আমি কী করেছি?

কবির স্বাধীনতা আসলে কী? সেটা কি হৃদয়ের অজানা স্থানের মধ্য দিয়ে কোনো পথ? একটি পথ যা একই সাথে অলৌকিক, অসীম এবং তবুও যা পূর্বাভাস পায় মৃত্যুর? সেটা কি এমন একটা মুহূর্ত যখন কেউ শুনতে পায় বহু দূরবর্তী কোনো ঢেউয়ের শব্দ, আছড়ে পড়া সফেন তরঙ্গ যেখানে সৃষ্টি করছে কোনো অপার্থিব ওষধি যা দূরে সরিয়ে দিতে পারে মৃত্যুর বোধকে?

কি লেখেন কবিরা সহজাত প্রবৃত্তি, ভালোবাসা আর মৃত্যু নিয়ে? কেন লেখেন? অথবা আরো বেশি কিছু কি আছে? সময়ের উপস্থিতি— সে তো সবসময়ই সঙ্গে রয়েছে। কবির পেছনে, তার কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে রয়েছে।

কবিতা তখনই সত্যিকারের অর্থপূর্ণ হয়, যখন তা বেঁচে থাকার রসদ হয়ে ওঠে।

বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, যে-কেউ এটা অনুভব করতে পারেন যে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই আজকাল দু-ধরনের কবিতা লেখা হচ্ছে— এক, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিকতাকে তোষামোদ করে লেখা হয়, এবং যেটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কবিতা, কেননা, এর ফলে কবিকে কোনোরকম ঝুঁকিও নিতে হয় না, বিপদেও পড়তে হয় না। অন্য একটি ধরন, যা আগেও বিভিন্ন জায়গায় লেখা হয়েছে, আমাদের এখানেও হয়েছে, খুবই বিপজ্জনক, কারণ, মূলত এই ধরনের কবিতা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে সমালোচনা করে লেখা হয়, এবং ফলে কবির পক্ষে খুব মঙ্গলজনক নয়। আমি সেই সমস্ত লেখার কথা বলছি না, যেগুলো নাকি ইচ্ছে করেই বিপরীতভাবে লেখা হয়, এবং যাতে 'রাজনৈতিক লেখা' বলে লেবেল লাগানো যেতে পারে, নিজস্ব সচেতন দায়িত্ববোধের থেকে কবি বা লেখক যে লেখা লেখেন,আমি বলছি সেগুলোর কথা। এই দায়িত্ববোধ তখনই সম্ভব, যখন কবি নিজের সচেতনতা সম্পর্কে নিজেই দায়িত্ববান থাকেন। এটা কখনোই উপদেশ দেওয়া যায় না যে কবিকে দার্শনিক বা ধর্মগুরুর ভূমিকা পালন করতে হবে, কিন্তু তিনি যা বলছেন, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সেই কণ্ঠস্বর যেন নিজের অন্তস্তল থেকে তিনি শুনতে পান। এবং এমনও হতে পারে যে, যে পৃথিবীতে তিনি বাস করছেন, সেখানে তাঁর দেখা অসংখ্য জীবনযুদ্ধ তাঁকে এমন লিখতে বাধ্য করছে।

আমি যখন নিজের কথা চিন্তা করি, আমি অনুভব করতে পারি যে আমার অধিকাংশ কবিতাতেই আমার নিজের জীবন নিয়ে কিছু প্রশ্ন করি, যেন কেউ কোথাও থেকে হঠাৎ এসে আমার সত্ত্বার ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে, যেন এর সাথে আগে কোনো পরিচয়ই ছিল না, অথবা হয়তো কখনো আবছা কোনো ঝলক দেখেছে মাত্র। প্রায়ই এই প্রশ্নগুলো উত্তরের সীমার বাইরেই থেকে যায়। আর এই সমস্তকিছুর থেকে আমি উপলব্ধি করতে পারি যে আমি কতটা বিভ্রান্ত— যেন আমি রাস্তার সেই নামহীন মানুষটির মতো, যার সাথে আমার রোজ দেখা হয়।

আমি চেষ্টা করি বুঝতে যে, আমার লেখা কবিতাগুলো আসলে কী হচ্ছে। এবং আমার

মনে হয় এটাই ঠিক যে সমস্ত কবিরাই বোধহয় এমনটা করে থাকেন। আমি আমার লেখা কবিতাগুলোর দিকে তাকাই, খুব নিবিড়ভাবে দেখি, শুনি। এবং তারপর কবিতাটা আমায় নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে বলে যে, আমি কি এই কবিতাটা নিজের জন্যই শুধু লিখেছি, নিজেকে এবং অন্যদেরকেও দেখাতে যে আমি কত চালাক? নাকি এটা শুধুই একটা খেলা, আমার এই কবিতা কি সময়ের উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতি, যেটা নাকি মৃত্যু-চিন্তায় সম্ভব, তার একটা খেলা? অথবা এই পৃষ্ঠায় লেখা এই যে কবিতাটা চেয়ে আছে আমার দিকে, তার কারণ কি কিছু একটা ঘটেছে?

যদি আমার মধ্যে একটুও দ্বিধা থেকে থাকে যে আমি স্বীকার করব, না সত্যিই কোথাও কিছু ঘটছে না, তাহলে আমার মনে হয় এটাই উপযুক্ত সময় নিজেকে নিজের প্রশ্ন করার, আমি কি প্রকৃতই একটি মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করছি, যে কিনা অন্যদের জন্য অনুভব করে, যত্নবান হয়? যদি আমার উত্তর হয়, হ্যাঁ, এবং আমার কবিতাগুলোতে সত্যিই যদি জীবনের কোনো অর্থ থাকে, তাহলে এমন অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারি, যাতে প্রমাণিত হয় কবিতা মুক্তি হয়ে উঠতে পারে, এবং মানবাত্মা কবিতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেতে পারে।

যদিও আজকের পৃথিবী ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং অতীতের মতো অবস্থা এখন আর নেই, কেউ এটা অনুভব করতেই পারে যে কিছু কবি এখন আর নিজের বিবেকের নির্দেশ মানেন না এবং আমরা কেউ কেউ কবিতার সাথে সত্যের যে পবিত্র বন্ধন সেটাকে ছিঁড়ে ফেলেছি। কবিতার অনন্ত যাত্রাপথে কবি সবসময়ই তাঁর নিজেকে চেনার চেষ্টা করে চলেছেন, বোঝার চেষ্টা করছেন তাঁর সত্ত্বার কোন্ অংশটি শেষ পর্যন্ত অন্য অংশটিকে হারিয়ে দেবে।

কারোর অন্তস্থলে কবিতার উপস্থিতি সম্পূর্ণ আগন্তুকের মতো। ভেতরের সেই মানুষটি একেবারেই অচেনা, এবং কবি প্রায় সবসময়ই সেই অন্য সত্ত্বাকে খুঁজে বেড়ান। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব? কীভাবে আমার বাঁচা উচিত? আমার সেই প্রায় অচেনা আমাকে কীভাবে আমি দেখতে পাব? আমার সেই অন্য সত্ত্বা, কোথায় তুমি? আমার মৃত্যুর ওপর কি আমার কোনো অধিকার নেই?

প্রশ্নগুলো খুব সাধারণ নিশ্চয়ই। কিন্তু সঠিক উত্তর পাওয়া খুবই মুশকিল। শুধু নৈঃশব্দই চেয়ে থাকে আমাদের দিকে, যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ আবার সমুদ্রের বুকেই ফিরে ফিরে আঘাত করতে থাকে। আমাদের চিন্তাসমূহ একটি প্রক্রিয়া, কবিতা নিজেই একটি প্রক্রিয়া—এবং এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা পরিমাণে হলেও মিশে থাকে স্বাধীনতা ও উৎসাহ। এবং কবি, তাঁর কবিতায়, তাঁর দেখা অসংখ্য মুখোশের মধ্যে থেকে প্রকৃত মুখটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন— নিজের মধ্যে সর্বোপরি বোধহয়— এমন কিছু একটা থাকে যা অবশেষে তাঁর দৃষ্টিকে প্রকৃত স্বচ্ছতা এনে দিতে পারে এবং সে কাজটা তিনি করতে পারেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে।

কাজেই যদি কেউ কবিতায় আবিষ্কার, পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে স্বাধীনতা ও উৎসাহের সঙ্গে, তবে একটা পরিণতিতে পৌঁছোনো যেতে পারে। এখন কবিতা নির্মাণের এই যে রহস্য তার গুরুত্বকে আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি।

কখনো কখনো রাতে আমি একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হতাশ হয়ে আমার সামনে রাখা সাদা কাগজের দিকে চেয়ে বসে থাকি। এক ভয়াবহ অভিকর্ষ যেন আমাকে টেনে নামিয়ে ফেলতে চায় যখন একটা শব্দও ঠিকঠাক কাগজে আসে না। তারপর আচমকাই যেন ধরা দেয় ভাষা, ছন্দের স্রোত বয়ে আসে, ঠিক যেমন অদৃশ্য কোনো হাওয়া হঠাৎ আমার ছোট্ট উঠোনের আমগাছের ডালটায় দোলা দিয়ে যায়। তারপর যখন কবিতাটা নির্মাণ হতে থাকে, এক অদ্ভুত উদ্দীপনার ঢেউ বইতে থাকে, কবিতার এই হয়ে ওঠা এক নির্ভার অনুভূতি এনে দেয়। এই যে এক ধরনের শূন্য মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি একেই বলা যেতে পারে মুক্তি।

এই লেখাটির শেষ পর্যায়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কী দিয়ে তৈরি? ক্ষুধা, মাটি আর গৃহকাতরতা দিয়ে? তারপরেও আমি বুঝতে পারি আমার চারপাশের পৃথিবীতে যাকিছু ঘটছে, তার প্রভাব আমি এড়াতে পারি না। আমার আজকের দেশ, আজকের পৃথিবী যে দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে তা আমাকেও আঘাত করে। এবং আমি কে, আমি কী হতে চাই এই বিশ্লেষণে আমি বলব যে আমি এমনভাবে কবিতা লিখে যেতে চাই, সূর্যের কিরণ যেমন সমান যত্নভরে ছড়িয়ে পড়ে একইভাবে রাষ্ট্রপতিভবনের বিস্তৃত বাগানের কোমল গোলাপের পাপড়ির ওপর অথবা ইঁদুরে ঝাঁঝরা করে ফেলা আমার শহরের সেই চালাঘরগুলোর ওপর, যেখানে উপোসী জীর্ণ শিশুরা এখনো ঈশ্বরের প্রার্থনায় রত। এবং ক্লান্ত, পরিত্যক্ত আমার চারদিকে আমার শব্দগুলো ভিড় করে কোলাহল করতে থাকে। আমি বেরিয়ে আসতে চাই। এ যেন এক অন্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

ওই ঝরে পড়া পাতাটির কান্নায় কাঁদবে কে? গ্রীষ্মের বয়ে যাওয়া শীতল বাতাসের ফিসফিসানিতে কে ফিসফিসিয়ে উঠবে? রাজনৈতিক নেতা না কবি? একটি শিশু খেলাচ্ছলে যে পাথরের টুকরোটায় লাথি মারল, তার নীরব ব্যথা কে অনুভব করবে? একটি অজানা হাত যে গোলাপটিকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিল, তার ফুঁপিয়ে ওঠা কে শুনতে পাবে? একমাত্র কবিই তো।

এই পৃথিবীর কাঁধ থেকে সময়ের বোঝা নামিয়ে ফেলতে কবিতা একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা হয়ে থেকে যাবে এবং সেকাজে সফলতার জন্য প্রতিচ্ছবি, রূপক, প্রতীক ব্যবহার করে করে কাব্য লেখা হতেই থাকবে। সময় চিরকালীন, চির প্রবহমান, আমাদের জাগিয়ে রাখে যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, রাতের নৈঃশব্দ্যে অনুভব করায় আমাদের নাড়ির স্পন্দন এইখানে অথর্ব বেদ থেকে একটি পংক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে।—

"সপ্তরশ্মিরূপ রজ্জুযুক্ত, সহস্রলোচন, জরারহিত, প্রভূতবীর্য, কালরূপ অশ্ব আরোহীদের অভিমত প্রদেশে পৌঁছে দিচ্ছে। কুশল আরোহীগণ সে অশ্বে আরোহণ করে। সে অশ্বের গন্তব্য স্থান সকল ভুবন।"

*(**অথর্ববেদ।** ১৯ কাণ্ড। বাংলা অনুবাদঃ শ্রী বিজনবিহারী গোস্বামী। হরফ প্রকাশনী। কলকাতা-৭)*

এবং কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে ঃ কবি কি সময় থেকে মুক্তি পেতে সময়কেই ব্যবহার করবে? নাকি সে মুক্তিটুকু অনুভব করার জন্য কেবলমাত্র সময়ের একটি মুহূর্তের একটি ভগ্নাংশকেই অর্থবহ করে তুলতে চাইবে?

বারে বারে মানুষ সেই বন্ধ দরজার কাছে ফিরে আসে। সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে। আমি জানি না, যে ওখানে রয়েছে, সে কী চায়। আমার কাছে এটাই আশ্চর্য মনে হয় যে আমার রাগ বা যন্ত্রণা এবং আমার বেঁচে থাকা নিয়ে আমি কবিতা লিখে ফেলতেই পারি, এবং এইভাবে পৌঁছোতে পারি নিজের কাছে কিংবা নিজের থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, অন্ধত্বেই হোক বা আলোর উচ্চারণে, আর সেটাকেই বলতে পারি মুক্তি। যা কিছু আমরা স্বপ্নে দেখি, তাকে যদি আমরা প্রবেশ করাতে পারি জাগরণে, হয়তো কিছু একটা ঘটতে পারে, কিছুটা আত্ম-সমীক্ষার মতো, বা একটা প্রার্থনার মতো যা কিনা সময়ের ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্তত আমাদের একটু আত্মপ্রকাশের আনন্দ এনে দিতে পারে, এটাই তো মুক্তি।

সুতরাং অন্য সবার চেয়ে কবির মানুষ হওয়া প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। কবিকে তাঁর অন্তঃস্বরকে শুনতে হবে, অনুভব করতে হবে সে কতটুকু করার ক্ষমতা রাখে। সবার পৃথিবীতে হয়তো কবি সম্পৃক্ত হতে পারেন না, তাঁকে জলের মতো হতে দাও, যে নিজের স্রোত খুঁজে ফিরছে, যদি তাকে এই মাটি শুষেও নেয়, যদি তার কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাও থাকে, তবুও তাকে বয়ে যেতেই হবে। এইভাবে আমাদের বেঁচে থাকার, আমাদের বিশ্বাসের বহু পৃথিবীর—মনুষ্যত্বের, ইতিহাসের, নৈতিকতার, মধ্য দিয়ে বইতে বইতে আজকের কবিতারা হয়তো ছুঁতে পারবে মুক্তির হৃদয়।

তবে কি কবিতা আমাদের জীবনের কিছু অর্থ খুঁজে দিতে পারে, বাস্তবে যাতে সত্যিই মুক্তিকে স্পর্শ করা যায়? অথবা সেটাই কি মুক্তি যা কবিতাকে সত্যতা এনে দিতে পারে—যেখানে সে বলে উঠতে পারে মানুষ হওয়ার যথার্থতা কী।

প্রতিটি মানুষই স্ব-স্ব জীবনে অনন্য। কিছু না কিছু স্ফুলিঙ্গ প্রতিটি হৃদয়ে খুঁজে নিতে হবে। জরুরি নয়, সবাইকেই কবিতা লিখতে হবে, কিন্তু অন্তরে যে সম্পদ রয়েছে, তা জীবনকে যাপন করার এক সুনিশ্চিত দিশা দিতে পারে।

আজ সন্ধ্যায় এখানে উপস্থিত প্রতিটি হৃদয়-বাগান শত শত গোলাপের উচ্ছ্বাসে ভরে উঠুক, এই কামনা করি।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

২০১৬ সালের জুলাই (৩০-৩১ জুলাই) মাসে শিলং-এ অনুষ্ঠিত সাহিত্য অকাদেমির 'অল ইন্ডিয়া পোয়েটস্ মিট'-এর উদ্বোধন করেছিলেন ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের পরম শ্রদ্ধেয় কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক শ্রী জয়ন্ত মহাপাত্র। অনুষ্ঠানে তাঁর এই অসাধারণ ভাষণটি শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমার অনুরোধে লেখাটি তিনি *ভাষাসাহিত্যে* প্রকাশের জন্য দেন। নিঃসন্দেহে লেখাটি প্রকাশ করে আমরা প্রাণিত ও সমৃদ্ধ হলাম। এই বিষয়ে পাঠকদের কাছে আলোচনা আশা করছি। এবং গঠনমূলক লেখাগুলো *ভাষাসাহিত্যের* পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।--**সম্পাদক।**

পঙ্কজ বণিক

হেমন্ত

সংক্ষিপ্ত হেমন্ত রেখে গেলাম একটি মোমের কাছে
গলে মিশে যাবার আগে দেখব এই তো চাঁদের অশ্রু
দাবানল ক্ষত বনে কুয়াশা নেমে আসে গভীর রাতে
ভোর ভোর আলোয় দীর্ঘকায় যে লোকটি
খালি পায়ে হেঁটে যাবে মাঠের দিকে
তারই নাম শুশ্রূষা
একটু ছোঁয়া পেতে তার
প্রতিটি পুরুষ মনে জেগে ওঠে সুজাতা
আমাদের পুরো গ্রাম হয়ে ওঠে বুদ্ধের মুখ
মাঠে ঝরে পড়া ধান কুড়োতে আসে চাঁদ।

অমাবস্যা

যে দুঃখ জেগে উঠেছে, তা অমাবস্যা
যে আলো নিভে আছে, তা অন্ধকার।

আকাশপ্রদীপে জেগে থাকে রাত
প্রণাম হয়ে বাগানে ফুটে ওঠে ফুল
ভেতরের হাহাকার সব পতঙ্গ হয়ে
আগুনে আত্মাহুতি দিতে যায়

অন্ধকার কেটে গেলে
যা পড়ে থাকে আলুথালু, তা অভাব
আমাদের অভাবগুলো দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে
উটের পিঠে চড়ে
সেখানে সূর্যাস্ত নেই, অমাবস্যা নেই...

নিদ্রাগত

প্রতিদিন সকালে যে বৃক্ষটি দেখে
আমার নিদ্রাকাতর চোখ সতেজ হয়ে ওঠে
পরে জেনেছি তাতে নিদ্রাদেবী বাস করেন।
আমারই সীমানায় কেন এই দেবীর বসবাস!
যেদিন জেনেছি, একটু লক্ষ করে দেখি
মাকড়-জালের বিস্তার বেড়ে গেছে বাড়ি জুড়ে
ভাবি, ঘুম ও মাকড়সার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে
এইরকম যে, আমার ঘুমকাতুরে মুখ বেয়ে
যে লালা নিঃসৃত হয় তা-ই মাকড়সারা নিয়ে যাচ্ছে কৌশলে
আর সুতো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে জালে জালে
আমার ঘুমের তীব্রতায় তারা যে এরকম জেগে থাকে
এ-কথা জেনে যেতেই বুঝতে পারি
জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ কেটে গেল ঘুমে
আর বাকিটা গেল মাকড়-জাল নিধনে,
তেমন আর কোনো মাহাত্ম্য খুঁজে না পেয়ে
একদিন সেই বৃক্ষটির শরণাপন্ন হই
নিদ্রাদেবীর দর্শন পাব এই আশায়,
বৃক্ষের কাণ্ড ফুঁড়ে দেবী বেরিয়ে আসেন সহসা,
সুদীর্ঘ চুল আলুথালু। বলেন, 'কি চাও, মানব?'
'আগামী বারো বছর চোখে আমার ঘুম যেন না নামে'
'তবে এই দীর্ঘ বারো বছরের নিদ্রা কে নেবে?'
সেই থেকে বৃক্ষটি এক যুগ ঘুমে ঢুলে পড়ে
নিদ্রাদেবীও এই সময়কালে অন্যত্র সরে পড়েন,
আর আমি শশব্যস্ত হয়ে মাকড়-জাল সরাতে থাকি...

ভ্রমণকাহিনি

ভ্রমণকাহিনির মতো সেজে ওঠে শীতকাল,
গোটা পাহাড় শুয়ে থাকে লেপের নিচে
কুয়াশামাখা সূর্য ওঠে মধ্য দুপুরে
ব্রহ্মফুল ফুটতে থাকে পাহাড়ের ঢালু জুড়ে
পশমহীন ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়ায় ইতিউতি
চেয়ে থাকে পর্যটকদের রঙীন সোয়েটারের দিকে।
ভ্রমণকাহিনিতে অযাচিত এসে প্রবেশ করে
ওল কারখানার ব্যবস্থাপক
ওলের প্রচারে পর্যটকদের মনোযোগ করে আকর্ষণ
ভেড়াদের কোনো বিবরণ নেই সেখানে
তারা নীরবে কুয়াশাভেজা ঘাস খেতে থাকে
ভেড়াদের ঘাস খাওয়ার শব্দ
ভ্রমণকাহিনির পৃষ্ঠা ওল্টালে টের পাওয়া যায়।

একসময় পাহাড় থেকে শীত নেমে যায়
দিনশেষে যেমন ভেড়ার পাল,
পত্রমোচন শেষে সবুজ হয়ে ওঠে সমতল
শীতের উল্লেখ আর থাকে না কোথাও।
সকল ভ্রমণকাহিনি চির রৌদ্রকরোজ্জ্বল,
ভেড়াদের দুঃখ শুধু চাপা কুয়াশা হয়ে ভেসে বেড়ায়।

পায়েল দেব

বান্ধবী

এক উত্তপ্ত মায়ার ঘোরেই
কদিন ধরে মেয়েটি ঘর তৈরি করছিল
ঘরের ভেতর ঘর
অনেকগুলো বিছানা
শুয়ে-বসে থাকা কয়েকটি প্রাণ
চারদিকে পারদের প্রলেপহীন আয়না-কাচ
এক সিরিঞ্জ স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিয়ে
সাদা জামা পরা সহাস্য পরিরা
মুছে দিত ক্লান্তি আর অস্থিরতা
সকালে বিকেলে নিয়ম করে
পরিদের সর্দার মেয়েটিকে দেখতে এলে
ড্যাবড্যাব চোখে সে জানতে চাইত বন্দিদশার মেয়াদ
দিনরাত্রিহীন সশব্দ সময় পেরিয়ে যাবার সরল নিয়ম

একদিন কেউ এসে মেয়েটির হাত ধরল
চুমু খেল কপালে
বকবক করে গেল কত কথা,
হাত বুলিয়ে দেখল
চুল, গাল, হাত ও পায়ের আঙুল
আশীর্বাদী মেখে দিল কপালে।
মেয়েটি মুচকি হেসে বলল
'আমি ভালো আছি'...

খেলা

প্রতিটি শুভ জন্মদিন আমাকে মিশরীয় মমির গল্প শোনায়
সরু আঙুলের মেয়েটির কথা বলে
যে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিল মিশরে
মেয়েটির মনে সৌখিন শুভ্র তুষারপাত
মলমল কাপড়ের মতো নরম হাতে
মেয়েটি স্পর্শ করে দেখেছিল সবকটি বন্দি শরীর
কিছু তকতকে ক্ষতের দাগ। কি একটা মাপ ঠিক করে
নিজের চারদিকে বক্ররেখা টেনেছিল মেয়েটি
একসময় নিজেই আটকা পড়ে যেতে লাগল
ছোটো থেকে বড়ো অনেকগুলো বৃত্তের ভেতর,
মমি হয়ে যেতে থাকল তার বক্রীকরণ কৌশল।

প্রতিটি জন্মদিনে আমিও একটু একটু এগোই
দূরে মমির দেশ
বড়ো থেকে ছোটো, আরও ছোটো, আরও ছোটো
বিন্দু হয়ে যাচ্ছে বৃত্তগুলো...

নিরুদ্দেশ যাত্রা

রাতের বেলা খুব জ্বর এলে জল জল চোখের উপর
বিরাট একটা আকাশ এদিক থেকে ওদিক উড়ে বেড়ায়।
উড়ন্ত আকাশের বুকে ঠেস দিয়ে
চার-পাঁচটি গাঙচিল আমার দিকে মুখ ভেংচি দেয়।
জ্বরের ঘোরে আমার যখন চোখ বন্ধ হয়ে আসে
তখন এরা চুপিচুপি এসে আমার আর শীতঋতুর সেলফি নিয়ে যায়...
পরের দিন সংবাদ শিরোনামে
সেই গাঙচিলদের নিখোঁজ হবার খবর বেরোয়
এরপর ইচ্ছে করে কতবার জ্বর বাঁধাই
রঙীন তেরপলে ফুঁ দিয়ে আকাশ ওড়াই
রাতের গাঙচিলরা তবু আর কোনোদিন ফেরে না।

চিরশ্রী দেবনাথ

নাটমন্দির

নাটমন্দিরে কিছু মানুষ জমে ওঠে, তাদের চোখের
কোণে জমে আছে অতীত, এখানে যেন মৃদঙ্গটি
ঘুমিয়ে, তার বাদামি বুকে ষোড়শী শৃঙ্গার...
মেঘের মনখারাপ। বেঁচে থাকার উদাসী পদাবলী প্রতিদিনের
মতো গায় রূপহীন বৈষ্ণবী, রাধা নামে গান নয়
বেসুরো অভিমান সুরে বেজে যায়। কারা যেন বসে
থাকে, শিশিরের কলরবে, তারাই আচ্ছন্ন মানব-মানবী
শিকারের মাংস সাজিয়ে, বহুকাল আগে থেকে
তারা বলে গেছে, দেহ অথবা প্রেম ঈশ্বরের কথা বলে যায়...

মৎস্যকন্যাদের বাড়ি

যে-পথে আমার কালবেলা চলে কলরবে
সে-পথের ধারে একটি বাড়ি 'মৎস্যকন্যা'
মনে মনে ভাবি, কেমন জানি সে-বাড়ির মেয়েরা
প্রসাধন শেষে কি তারা ডুবসাঁতার দেয়?
ঘরময় ভেসে আসে বসন্তবরণ ঢেউ?
সিলিং ফ্যান থেকে ঝরে পড়ে নোনা বাতাস
দেয়ালে ঝিনুকের গুঁড়ো,
কোনো এক যুবক দাঁড়ানো জাহাজের ডেকে
একটি মৎস্যকন্যা তার টুপিতে রেখে যায় রুপোলি আঁশ
যুদ্ধের ক্ষত গায়ে মেখে থাকা সাবমেরিন, নিহত
উষ্মায় ঘরের ঝোপঝাড়ে...
আমাকে ভাসায়, সেই সমুদ্র
নিঃসঙ্গ শহরে পথ হারানো ঈগলের ডানার মতো

আমি পেরোতে থাকি কুয়াশা মাখা গলির মোড়
দপ্ করে জ্বলে ওঠে লোভ...মৎস্যকন্যাদের বাড়িতে।

গ্রহান্তরে

মঙ্গলগ্রহের মানব-মানবী
পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে এসেছে ক্ষুধার সুগন্ধি
ঈর্ষার কারুকাজ, প্রেমের নিঃসঙ্গতা, সঙ্গমের দৃশ্যান্তর, তারা দেখতে এসেছে
ভরা কোটালের দিন শরীরে কি জেগে ওঠে ফসলের মাঠ
ধূপ জ্বালা করা চোখে কিভাবে ভেসে আসে ঈশ্বরের জল
পশুর লোম ঝরা আলপথে কি থাকে নারীর আদর
এসবই সাজাতে হবে লালগ্রহের শূন্যতায়
পৃথিবীর খামে খামে আজ সাজানো ইন্দ্রিয় সুখ,
তমোগুণ, অস্থির ঋতুর ঝরো দিন
সবকিছু নিতে চায় ভিনগ্রহ
নিঃশর্ত মৈথুনে তারা জন্ম দেবে নিখাদ কালো মানুষের...

নীপবীথি ভৌমিক

অবশেষে

অবশেষে সবাই সেই উদ্দেশ্যের পথের পথিক হই
ধুলো মাখি নিজ নিজ স্বার্থ পথের,
অথচ এমনকি কোনো কথা দিয়েছিলাম কখনো?
বন্ধন ফুলের গায়ে তো আজও লেগে আছে পবিত্রতার সুগন্ধি
হ্যাঁ, কিছু বিষাদ এসেছিল এ-পথে ঠিকই
ভুল বোঝাবুঝির পশ্চিম বাতাসও মেখে নিয়েছিল ক্লান্ত চোখ!

তবু, বিচ্ছেদ কেন ডাকো?

তোমার পুরোনো অ-সুখগুলো ছুঁয়ে দ্যাখো একবার
বিষাদও অনেক বড় সুখ।

চিত্তরঞ্জন দেবনাথ

পাণ্ডুলিপি

চৌরাস্তায় বোবা আইল্যান্ড, এক টুকরো সবুজ , ফাইলের
নোট ডিঙিয়ে ফোটন কণা খাচ্ছে, এই দৃশ্য সরে যেতে যেতে
দেখি বেহায়া একটা সন্ধে বাড়ির ছাদে বসেছে পা ঝুলিয়ে
এল ই ডি জোছ্নায় শিবের বাহন জাবর কাটে
কিছু সংগ্রামী জীবন গল্প হয়, গোবরের মতো লেপ্টে যায় কিছু
পথিকের ছায়া মুছতে মুছতে বসন্ত বাতাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে
নিঃশব্দে ঝুল বারান্দায় দাঁড়ায় যে মেয়ে
তার স্থির দীঘল চোখের কোণে।
ঠিক তখনই স্টেশনের ট্রেন
দূর গন্তব্যে একটু একটু করে নিয়ে যায়
তার একমাত্র জীবিত পাণ্ডুলিপিটি।

ভবঘুরে ঈশ্বর

অ্যালঝাইমারগ্রস্ত রোগীর মতোই
ঈশ্বর বসে থাকেন পার্কের বেঞ্চে
স্টেশনের এফ বি ও-তে হেলান দিয়ে
আদিগন্ত আলোর নিভে যাওয়া দেখেন
সন্ধ্যা এসে বসে ঈশ্বরের রেটিনায়...

ভুল ট্রেনের খোঁজে ট্র্যাকে ট্র্যাকে হাঁটেন
ভিড়ে মিশে যান, ভিড় একা করে দেয় বেচারাকে।
ঠিকানা ভুলে ঈশ্বর আমাদের ঠিকানায় কড়া নাড়ছেন
ভুল, সব ভুল বুঝে ঝিমিয়ে পড়েন তিনি
শহরের চুরি যাওয়া পুকুরের মতোই।

অবশেষে
মাঝরাতে
স্বর্গসোপান ভেবে
যে-বাড়ির ডোরবেল চাপেন
সেটা একটা ব্যস্ত পানশালা।

মৃণালকান্তি দেবনাথ

শীত-১

রাতকানা পাখি জানে না ক্যারলের সুর
রক্ত সম্পর্কিত ঘুণ চেনে বার্মিজ সেগুন
প্রণয়তাড়িত আমিও সহজেই ধরে ফেলি
মানুষের যাবতীয় প্রত্নবহুগমনের কথা

পালাতে পারে না কেউ এই জতুগৃহ ছেড়ে
শুধু চিনে রাখতে হয় সব উড়ান-কৌশল
এই ভাঙা ডিসেম্বরে সুরকানা মানুষ আমি
অস্ত্রবিরতি মেনেই গভীরতা মেপে নিচ্ছি

শীতঋতু চলাকালেই চিনে নিতে হবে সব
পতাকার রং আর সঙ্গীতের তাল লয়

শীত-২

পাখিদের জন্মদিন পালন উৎসবে
কিংফিসার নিয়ে বসে ঘরপালানো সাপ
নীহারিকা এঁকে ফেলে কাঁদেন ভ্যানগখ
ছবিটুকু লিখে রাখে লাজুক যুবক

এইসব দৃশ্য দেখে এটিএম কার্ড
চিমনিতে ছবি আঁকে মুগ্ধ কারুকাজ
মেঘে মেঘে ভরে থাকা যেখানে পলাশ
সেখানে ফেরেন কবি ও কোপার্নিকাস

দলবেঁধে গান হবে এই কথা ভেবে
দয়ালু মার্কস আর রবিবাবু কবি
সত্য সুন্দর মেনে আকালের দিনে
গানে গানে এঁকে যান সুদিনের ছবি

তিরখেলা ভুলে যাওয়া গ্রামের মেয়েরা
মনে মনে চিরদিন চেয়েছিল যাকে
সেইসব যুবকের অমল স্মৃতিতে
শীতের নিরালা বেলা শস্য তুলে রাখে

পাশ ফিরে চলে যায় অভিমানী নদী
আহা সে-জীবন আর ফিরে আসে যদি
বৃষ্টিসখা মাঠ ছিল ধানের কাঙাল
ভোলেনি আমাকে শুধু রান্নাবাটি গান।

অনিরুদ্ধ সাহা

অশরীরী

এক.

শীত এসেছে ধরে নিয়ে আমরা পিকনিকে যাই
বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে কাঁদে অবসাদধৌত হৃদয়
আমরা চাইলেও উন্মাদনা ছাড়া বেরুতে পারি না
নিরীহ খালাসি বসে থাকে চালকের মূল সিটে।

দুই.

সামগ্রিক বাধা আর নীরবতা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে
অসহায় পথের দু-পাশে যেমন সারি সারি আদিম গাছ
প্রকৃত মানুষের ছায়া সেখানেই আদর্শ ফুলের রূপ নেয়
সুগন্ধ ছড়ায়, মাসের পর মাস, ইতস্তত, বিব্রত ময়ূরের মতো।

তিন.

কেন আসে? কেন ফিরে যাও? এমন অন্ধকার রেখে?
একটি চড়ুইভাতি একা বসে রয়েছে রক্তমাংস নিয়ে।

শ্রী

কত কিছু নিয়ে ফিরে আসে মানুষ!
রাতে নিজগৃহে।
কুয়াশাপ্রধান একাকীর চাঁদ
মোহানায় মেশার আগে একটি নদী।
ঘুমের ঘোরে গুনগুন করা কোকিলের অসমাপ্ত গান
বর্ষার সময়, মস্তিষ্ক জুড়ে অনন্ত একটি জলধি
কত কিছু ফেলে আসে মানুষ!
পথে একটি শব্দ নিজের মনে করে!

যেমন,
মাসের শেষভাগে নির্ধারিত রেশন নেওয়া হয়নি
সন্তানের জন্য পরিমিত ওষুধ এখনো দোকানে
লেখার দরুণ সামান্য নিজস্ব সময় ভেসে গেছে
ভুল করে গেয়ে যাওয়া একটি গানের স্বরলিপি
আমি,
আজও,
ঘরে ফিরে দু-চোখ ভরে দেখিনি!

রাতের চিঠি

একেকটি কবিতা তোমার সমগ্র একটি দিনের যাপন।
তার শব্দচয়ন, লেখার পদ্ধতি, হৃদয়ের একা অনুষঙ্গ
তুমি নিজেই। বাগানের ফুলের দিকে তুমি তাকিও না
তোমার অন্তরেই দিগন্তের সৌরভ লুকিয়ে রয়েছে।

জীবনে কখনো না-দেখা একটি গেটের রাখাল তুমি
পর্বত পেরিয়ে এসেছো পোড়া বাঁশি ঠোঁটে নিয়ে
একেকটি কবিতা তোমার সমগ্র একটি দিনের যাপন
মনে রেখো অনিরুদ্ধ, মৃত্যু হয়ে প্রেম হয়ে আমি আছি।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

বীজ

মাটি কত পুরোনো, কত
রক্তধূলি থেকে কুড়িয়ে এনেছি একটা বীজ
অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এনেছি
চারদিকে দৃষ্টির এত শকুনবিস্তার
একে লুকোবো কোথায়!

শুধু এক আঁজলা জলের জন্য অপেক্ষা
উড়নচণ্ডী হাতে তুমি জল দাও
জল দাও একটা বীজের জন্য।

আর একবার নিজের হয়েও সকলের জন্য হওয়া দরকার
তারপর পাথুরে ভালোবাসায় ঘুমোতে যাবো
যাবো সন্ধ্যাযাত্রী হয়ে
মাটির বিশ্বাসে রেখে যাবো আকাশ বিভাজন।

ধর্মযুদ্ধ

ধর্ম যাকে হত্যা করে
সেই রক্তের বয়স ধর্মের চেয়ে অনেক প্রাচীন।

অথচ হত্যাতেই আস্থা তোমার।

তোমার যুদ্ধ-চঞ্চলতায় সমস্ত মাটি আজ অস্থির
রক্তচন্দনের ফোঁটায় উৎসবের প্রহর গুনছে তোমার সেনাদল।

মহেঞ্জোদড়োর ওপর পা ফেলে ফেলে যখন হাঁটছিলে
আমরা দেখেছিলাম তোমায়,
একচোখ বিশিষ্ট ক্যামেরাগুলো দেখল না
আসলে দেখেও দেখল না।
রাত্রির অন্ধকারে একটা ধাতু যখন ক্রমশ ফলা হয়ে উঠছে
আর দুটো চোখ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত

সেই ধ্বংসকে কুড়িয়ে তুমি নতজানু হয়েছিলে মন্দিরের পাদদেশে
কেউ কেউ জয়ধ্বনি দিয়েছিল সেইদিন।
তোমার ভেতরে চলছিল পরবর্তী প্রতিশোধ জাগানোর ব্যস্ততা।

তোমার ধীক্ষমতা আসলে একটা মুখোশ
তুমি ধরা পড়ে গেছ।

তন্ময় দেবনাথ

কাঁচপোকা

১.
বালির ঘরে কালো পোকা
পোকারা সবুজ পাতা কাটে

২.
চোখ থেকেও দূরে
কর্ণিক দৃশ্য

৩.
হাঁড়ির কেন্দ্রে
আণুবীক্ষণিক দুর্বোধ্যতা

৪.
দাবিদাওয়াগুলো তুলে রাখো
পচবে না
কিছু পাথর পাওয়া যাবে।

৫.
অনেক বেঁকে গিয়ে
বেসাতি
পয়সা ফুল

৬.
সময় জ্ঞানহীন আমি
ভবতরঙ্গে...

শরাফত হোসেন

রোদের শরীর

আর এভাবে মানুষ মানুষকে ছেড়ে চলে যায়
ফিরে আসি আমরা আবার
ফিরে আসি এই ব্যস্ত নগরে, কাচের শহরে

দেয়াল জুড়ে নরম রোদের আঁচড়
মগজে তুলেছে ঢেউ বুনো জোছনার ধূ-ধূ মাঠ
এইদিকে
বৃষ্টি ও জোনাকি থেমে গেলে, আমার ইচ্ছেরা জাগে
একটি হলুদ পাতা টুপ করে ঝরে পড়ে, আর—
ভেসে যায় নিশিডাকা কামনার স্রোতে

তারপর, পড়ে থাকে পত্রশূন্য বৃক্ষের বাকল
আর এভাবে বিচ্ছিন্ন হলে নক্ষত্রও ঝরে পড়ে
জানি এভাবেই মানুষ মানুষকে ছেড়ে চলে যায়
ফিরে আসি আমরা আবার
এই সীসার শহরে মানুষের ভিড় ঠেলে ঠেলে।

অখণ্ড

এক.
অজান্তেই প্রতিদিন দুঃখ রচনা করি
অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে কাচঘেরা পাতাগাছে
চোরাস্বপ্নেরা ডুবে থাকে গানে-কবিতায়

দুই.
অবিরত ঝরে পড়া
বৃষ্টির জলে জেনেছি
দুঃখ বলে কিছু নেই; আছে হাহাকার
অতৃপ্তি— না পাওয়ার।

তিন.
হলুদ শার্টে তোমার আকাশ ফিকে হয়ে আসে
কালো চুলে উপরে ওঠার সিঁড়ি
একটু হাসো— তোমার নিঃশ্বাসে গেয়ে উঠবে পাখি
বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে জলগুলো খুঁজে পাবে আশ্রয়

চার.
যেমন আমি— ভরদুপুরে, বৃষ্টিতে, রোদ্দুরে
এমনকি অন্ধকারে খুঁজে বেড়াই শব্দমালা
তোমার নূপুর, গলার লকেট, কানের দুলে
অথবা দীর্ঘশ্বাসে।

তুষ্টি ভট্টাচার্য

মুখস্থ

খসে পড়া তারাদের দেখে কিছু চাইতে নেই
স্বপ্ন দেখে হাসতে নেই—
রোজ এইভাবে চোখ রাঙায় কেউ আর
আমি মুখ বুজে পড়তে বসে যাই

নড়েচড়ে ওঠে খোলা বই
ঠোঁট কেঁপে গেলে বুঝি মুখস্থ করেছি।

পিচ গলা রাস্তা থেকে ধোঁয়া ওঠা দেখে
পারদ ভাঙা থার্মোমিটারের কাছে যাই
আর আয়নার কথা মনে পড়ে—

নিস্তব্ধ ঘর জুড়ে পিন পতনের মতো
বিড়বিড় শব্দ টুং করে পড়ে যায়।

মুজিব ইরম

চম্পূকাব্য

আমরা তিন মাইল পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যাই। ইদ্রিস মিয়ার পানের দোকানে পাড়ার সৌখিন বড় ভাইরা আমাদের সহপাঠিনীদের উচ্ছলতা দেখে দেখে সিঙ্গেল কাপ চায়ে চুমুক দেয়, স্টার সিগারেট ফোঁকে, আমির উদ্দিন ও মুজিব সরকারের বিচ্ছেদী শোনে, কুসুমবাগে দেখে আসা নতুন ছবিতে রাজ্জাক-কবরীর বাসর রাতের দৃশ্য নিয়ে ফিসফিস করে, আর যাওয়ার বেলা ইদ্রিস মিয়ার পানখাওয়া মুখ মলিন করে বলে যায়— লেখি লাইও। ইদ্রিস মিয়া ক্যাশবাক্সের ভিতর যতনে রাখা পেটলা লালখাতা বের করে নামের নির্ধারিত পাতায় বাকির অংক লেখে।... আমরা তিন মাইল কাঁচাপথ পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যাই, পিটি করি, জাতীয় সংগীত গাই, বাঁয়ে ঘুরে বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াই। ফিরতি পথে সহপাঠিনীরা রাস্তার অন্য পাশে কলহাস্য করে চারহাতি রাস্তাকে যোজন যোজন দূরত্ব বাড়ায়। বড় ভাইরা ইদ্রিস মিয়ার চা ফতুর করে। সদ্য জাগা নরম লোমের অস্তিত্বের মতো আমাদের বয়স বাড়ে। আমরা ইদ্রিস মিয়ার লালখাতায় নাম ওঠাতে চাই। ঘনঘন সিঙ্গেল কাপে চায়ে বনরুটি ও নোনতা বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে না-পারলেও ইদ্রিস মিয়ার লালখাতা আমাদেরকে ডাকতে থাকে।

একদিন সিঙ্গেল কাপ চা খেয়ে আমরাও বলি— লেখি লাইও! ইদ্রিস মিয়া ক্যাশবাক্সে যতনে রাখা লালখাতা বের করে নাম ওঠায়। আমরা বুক ফুলিয়ে ভাবি— ইদ্রিস মিয়ার লালখাতায় আমাদেরও নাম আছে!

২.

আমাদের গ্রামে আমরা কেউই আর আমি থাকি না! বালেগ হই আর দল বেঁধে আমি থেকে আমরা হয়ে উঠি। প্রেম করি, উড়-চিঠি লিখি, শিল্পি দিই, মক্তবঘাটে হল্লা করি। একজনের চোখের টান, বিনুনির ঢেউ, ওড়নার জ্যামিতি সবাই মিলে রাষ্ট্র করি। গোপনে গোপনে কাতর হই, তবু দলছাড়া হই না। আমরা কুসুমবাগের রুপালি পর্দায় আংশিক রঙিন বই দেখি, আর পড়শিনীকে নায়িকা করে পর্দা জুড়ে যুগল প্রেমের দ্বৈত সংগীত গাই। নাচেগানে নায়ক হয়ে উঠি। রাধানগরে বাউলি মারতে যাই। রাধানগরের দুই বোন আমাদের কাঁচা রাস্তা আলো করে বিদ্যালয়ে যায়। আমরা তাদের পায়ের নিচে হাওন মাসি কাদা হয়ে লেপটে থাকতে চাই। প্রেমিক হতে চাই। আমরা দলবেঁধে মুখস্থ করি— আতা গাছে তুতা পাখি ডালিম গাছে ফুল, এই চিঠির উত্তর দিতে হয় না যেন ভুল। আমাদের কেচমা পা কাঁপে, হাত কাঁপে, মন কাঁপে, চিঠি লেখা হয় না। তবু বাসনা করি চিঠি আসুক, জলছাপের পাতায়— তেঁতুলপাতা নড়েচড়ে, তোমার কথা মনে পড়ে। আহা, আমাদের কথা কি দুই বোনের মনে পড়ে?

৩.

শীত আসে আর আমাদের ভোরগুলো সংগীত হয়ে ওঠে। আমাদের রাজপথ কাঁপিয়ে বনভোজনের বাসগুলো দূরের পাহাড়ে যায়। আমাদের মাধ্যমিক মন উসকে দিয়ে বনভোজনের মাইকগুলো সুর ছিটিয়ে যায়! আমাদেরকে মাধবপুর ডাকে, শ্রীমঙ্গল ডাকে, জাফলং ডাকে। জল-পাথর-ঝরনা ও চায়ের বাগান আমাদেরকে বিবাগী বানায়। ফুজি ও কোডাক ফিল্মে ইয়াসিকা ক্যামেরায়, ও সহপাঠিনী, তোমার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, অর্ধভেজা পাথরে পাথরে, জলে ভাসা ঘাসে পাহাড়িয়া ভোরে তোমাকেই লক্ষ্য করে মাইকে আউলা-ঝাউলা হই। আর সেইসব পাহাড়িয়া ভোরে তোমাকেই লক্ষ্য করে মাইকে মাইকে ছড়িয়ে দিতে চাই কান্না ও নিবেদনের কণ্ঠ আমার!

আহা, আমরা গাউয়ালি বালকেরা কবে যে টাউনিয়া হবো, আর সহপাঠিনীদেরকে নিয়ে বনভোজনে যাব, গাবো, কণ্ঠছেঁড়া গান— চিরদিনই তুমি যে আমার! আহা, আমাদের গাউয়ালি মন, বহুপাক্ষিক বিদ্যালয়ের শীত, মনের বেদনা!

অরিত্র দে

Sea Song

যেভাবে একটা দুপুর পায়ে পায়ে
এগিয়ে যায় বিকেলের কাছে
তারপর হাত ধরাধরি করে
গিয়ে বসে সন্ধের পাশে ঝিলপাড়ে
তেমন একটা প্রেমের গান বহুদিন লেখা হয়নি
এখন একতারা বিপন্ন পড়ে আছে বারান্দায়
জাদুকর ফেলে গ্যাছে জোনাকির শুরুয়াত
বোবা হরবোলা ডেকে গ্যাছে অগোছালো রাত
ঝিনুকের মতো শুধু তুমি পড়ে আছো নিঝঝুম

হোমস

আমাকে কিনারা করো
আতশবাজির রাত আমাকে দূরের কথা বলে যায়
ফুরিয়ে আসা ঢাকের শব্দ
বলে যায় উৎসবের মিলিয়ে যাওয়া দিন
ছোটো হয়ে আসা বেলা এঁকে যায়
রোদের নরমে
তোমাদের চলাচল
প্রতিরাতে ভিজে যাওয়া ডানা
কাগজের প্লেন যতদূর যায়
ফেরিওলা ডাক যতদূর
তুমি তার কিনারা করো, হোমস
পুঁতে রাখা প্রত্নদেবতার মতো একা
চুরি যাওয়া স্যমন্তক মণিটির মতো
আমাকে তুমি উদ্ধার করো, হোমস

প্রতিশোধস্পৃহা

চুমু খেতে গিয়ে ঠোঁট পুড়ে গেল এমনি গরম
আগুনের দিন আমাকে নিয়ে গেল ইছামতির পাড়
দেখলাম অসহ্য ছিঁড়ে যাওয়া নদীর ধার
ঝলসে যাওয়া শহর, উতলা বিমানপোত
দোকানপাট বন্দর গলে গুলে মিশে গেল দিগন্তে
আর দেবতারা একে একে ঝাঁপ দিল আগুনের দিকে
সমস্ত চিৎকার গিলে ফেলে রাজা ঘুমোয়
সিংহতোরণ ফাঁকা
বড় রাস্তায় উঠে আমি উধাও হয়ে গেলাম আজীবন

মৌ সেনের কবিতা

১.
মা হতে গিয়ে
হাত, পা, গলা, বুক
খুলে খুলে ফেলেছি পথটায়

বলা তো যায় না
কোনোদিন ভুল করেও
সন্তান যদি মাকে খুঁজে পায়!

২.
দুপুর দুপুর 'নূপুর' তোমার কই?
ভুল করেছে মেঘনা নদী
নৌকা এবং ছই!

নূপুর নূপুর 'দুপুর' আমার সই
মেঘলা মেয়ে শব্দ আঁকে
জলের ভেতর ওই!

৩.
মায়া নেই তোমার ওপর
যা আছে তা মনুষ্যত্ব হবে!

আমি তো বলিনি কোনোদিন

তুমি রবে (?) ...নীরবে!

৪.
তারপর খেতে এলে
শিয়াল, শকুন, হায়না
বলে দিস আরো জোরে,
সর্বভোগ্য নয় এ শরীর—
কি হয়েছে যদি তোর
স্বামী তোকে খাটে নেয় না?

দাম্পত্য-২

আমি চাই
আমি ঘুমোলে তুমি মাথার পাশে বসে থাকো

আমি চাই
আমি ঘুমোলে তুমি প্রবলভাবে সজাগ থাকো

আমি চাই
ঘুমন্ত আমায়, অসহায় আমায় নিজের করে আগলে রাখো

আমি চাই

তোমার ওপর ভরসা করতে
যতক্ষণ না মাথার বালিশটা
ঘুমন্ত আমার মুখের ওপর

শক্ত করে চেপে ধরেছো!

প্রবুদ্ধসুন্দর কর

আর্তি

মেড়গাঁর পথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে
কেউ বলে উঠেছিল, এই গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈরি হয়
শুনেই মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

কোনো এক গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়
কেউ যদি বলে ওঠে, এই গ্রামে একটি লাজুক তরুণ বাংলাকবিতা লেখে
এই কথা শুনে আমি যেন ভাবসমাহিত হই।

তাঁর দরশন পেতে গেলে নির্জনে কাঁদতে হয় খুব
গত তিন দশক তোমার জন্যে আমিও কি লুটিয়ে কাঁদিনি?
তবু তোমার বিগ্রহ আজও অধরাই থেকে গেল
যা কিছু দিয়েছে ধরা, মায়া ও বিভ্রম।

আমাকে দর্শন দাও, আবহমান বাংলাকবিতা
সমূহ বৈভব ছেড়ে প্লাবিত নয়নে বীতনিদ্র আমি তোমাকেই ডাকি
অন্তত আকাশে সেই কালো মেঘ আর
ধবল বকের সারি হয়ে দেখা দাও
যে-আকাশ দেখে মূর্ছা গিয়েছিল বালক গদাই।

দরজা

যে তোমাকে ছেড়ে যেতে চায়
তাকে যেতে দাও
আটকে রেখো না।

একটি কথাও না বলে তার
ব্রিফকেস গোছাতে সাহায্য কোরো।
প্রেসার বা থায়রয়েডের ওষুধ সে যেন
ভুল করে ফেলে না যায়। শূন্যতা ছাড়া
সে যেন ছেড়ে না যায় আর কোনো স্মৃতি।

অশ্রুগ্রন্থি থেকে যেন বেরিয়ে না আসে সূচ্যগ্র তরল
ঘৃণাক্ষরেও তোমার মুখে যেন জলবসন্তের মতো
আর্তি আর হাহাকার না ফুটে ওঠে।

শুধু এগিয়ে দেওয়ার পথে নিচু স্বরে তাকে বোলো
দরজা ভেজানো থাকবে
টোকা দেওয়ার দরকার নেই।

আলতো ঠেলে দিলেই কপাট খুলে যাবে।

দেবপ্রতিম দেব

তিনটে কবিতা

১. তাপ

যে সন্ধ্যা এখনো হয়নি,
সেই সন্ধ্যার দিকে উড়ে যায় সুতো-কাটা ঘুড়ি,

সে-উত্তাপে জ্বলছে বিদেহ।

২. যমুনা

সন্ধে নামল ঠান্ডা হাওয়ায়,
স্মৃতিসৌধের মূর্ছানো প্রতিবিম্ব পড়ে থাকে।

যখন শীতল স্পর্শের ঢেউ-এ উথাল ঘুড়ি,
আমরা ধীর নেশায় নদীতীরে, হুইস্কি ও চেরি।

৩. ইথার

নক্ষত্রের সূক্ষ্ম আলোয়
পরিপাটি উচ্চারণহীন অন্ধকার,

সবকিছুর বাইরে এক অদ্ভুত
অন্বেষণ থেকে যায়,

স্থির কক্ষপথ ভাবায় সুখ শান্তি।

কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

এই শ্রাবণে

পথ ভুলে নয়,
আবার পথ চিনে এসেই পড়ল শ্রাবণ
চেনা পথও এখন বদলে গেছে অনেক
মাটি নেই, হাওয়া নেই, গাছপালা নেই
অনেক কষ্টে মেঘেদের ধরেবেঁধে
পাথরে কংক্রিটে ঠোক্কর সামলে ভয়ে ভয়ে—
তবু এসেই পড়ল শ্রাবণ।
ভিজে গেল রাস্তার কালো পিঠ, স্কুল-শিশুদের জুতোজামা
ভিজে গেল কালো বস্তি, সাদা দালান, ব্যালকনির পাতাবাহার
ভিজে গেল হকারের পসরা, কবিদের চশমা
ছাদে, উঠোনে পড়িমরি বউদের কাপড়চোপড়
ছাতা ভিজল, মাথাও ভিজল, ভিজল ছোটো-বড়ো কত বয়সী শরীর
তবু সব কি ভেজাতে পারলে তুমি শ্রাবণ?
আমাদের ছেঁড়াখোঁড়া সম্পর্কের নকশি কাঁথা,
ফুটোফাটা বিশ্বাসের তালাভাঙা বাক্স— আরো আরো
কত ধুলো-ময়লা আমরা আগলে রেখেছি, সন্তর্পণে।

এতকিছু ভেজালে তবু একটাও হৃদয় ভিজল কই?

আমাদের বারোমাস্যা

গ্রীষ্ম

আগুন ঝরছে
কথা থেকে
চোখ থেকে মুখ থেকে
সকালেই এত তাপ!
এইবেলা ভেতরে কিছু গাছ লাগা
নাহলে দুপুর পেরোতে পেরোতেই
ঝলসে যাবে যে—
তোর চারপাশ
তুই নিজেও।

বর্ষা

ঝরছে, ভাসছে
দু-কূল ছাপিয়ে
শুধু এটুকুই সত্য জানো?
আছে ভেজা মাটি
সবুজের কামনায় সিক্ত
বাঁধ বাঁধো। তাহলেই
দেখাবো ফুলের বাগান
ফসলের মাঠ আর
হাতছানি ঘর।

শরত

চলতে গেলেই এখানে ওখানে
সম্পর্কের টুকরো-টাকরা
পায়ে বিঁধছে, গায়ে বিঁধছে।
আগলে নাও— আকাশ বলল
জড়িয়ে ধরো— বিছিয়ে পড়া শিউলি বলল
স্বপ্ন মেলো— ছোট্ট মেঘের সাদা হাসি বলল
আমরা তোমাদের উৎসব শেখাব।

হেমন্ত

মায়ের মলিন আদর
ঘরের দিকে ডাকে
সন্ধে নামার আগেই।
ভরা সময়, তবু বিষণ্ণ
আজ খেলতে যাব না।
মাঠের দুঃখী কুয়াশা
আমার ভেতরে ঢুকেছে

শীত

গুটিসুটি
আমি আর তুই
ছেড়ে গেছে সবাই
বড্ড হিম
পেছনে সব সাদা
সামনে? চোখ চলে না
পা-ও চলে না।
রোদ তুই পাহাড় ডিঙিয়ে
আমার দরজায় আয়।

বসন্ত

ইঁট-কাঠ পাথরও
এত সুন্দর?
সাজ মন সাজ।
এখানে বয়েস বাড়া মানা
আবির, ফুল, প্রেম—
চোখ বোজো
যেটা ইচ্ছে তুলে নাও
দেখবে পৃথিবী এখনো সুন্দর।

সদানন্দ সিংহ

তোমাকেই নিবারণ

ওহে নিবারণ, তোমাকেই বলছি
শোনো।

নির্বাসিত সুড়ঙ্গের মাঝে
যে তক্ষকটি আজ রতিক্লান্ত
সে তোমারই সমগোত্রীয়,
জেনে রেখো।
তোমার অংশুমান ঠোঁটেই
ঝুলে থাকে বারোমাস্যা।
আর চোরাগোপ্তা
যে ঠিকানায় তোমার নিখাদ বিশ্বাস
তা পিতৃহন্তারক।

তোমারই বুকের এক অন্তিম বাগিচায়
বুনোহাঁসের রক্ত গলে গলে
জলো হয়, তবু উল্লাসপ্রিয় হে
তাতে কি
সংগোপনে, কি অভিমানে, কি বাষ্পায়নে
তোমারই সর্বস্বান্ত রাত
ক্রমশ বেড়ে যায়।
আর পৃথুলা দিবসের ছায়ায়
সংগঠিত বজ্রপাত নাকি বীর্যপাত,
কীট-সমুদ্রে এ কেমন পাল তোলা জাহাজ
ডুবে ডুবে আকণ্ঠ জল খায়।

জানি, এও জানি। সবশেষে এখন
এইসব স্বেচ্ছাচারিতার উৎসবও
ধীরে ধীরে একদিন কিংবদন্তি হয়।

ইদানীং

আজ
শহর জুড়ে
শীতের ওম।

ক্যাশলেস্ জীবন। তাই এখন
পথঘাট, ল্যাম্পপোস্ট, গাড়ি-ঘোড়া, রিকশা,
টায়ার পোড়া, রাস্তার শিশু, কুকুর, হি হি শীত
এবং আমি।

এবং তুমি।
এই রাত। হিমেল হাওয়া। চাঁদ পালানো। রিক্ত বাতাস।
চুপচাপ। বস্তাপচা। হিজলবন।

আজ
শরীর জুড়ে
কুয়াশা ঘুম।

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

মুদ্রাদোষ

ভাঙা রাস্তার ধুলো উড়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। গাছে গাছে কুসুমের হোর্ডিং শেষ হলেই নামে অশালীন ঝড়। বসন্ত চলে গেলে রুক্ষ মাটি ও আকাশ। নতুন উড়ালপুল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আগরফার কাঁধে। শববাহকেরা হরিধ্বনি দেবার আগে যেমন তুলে নেয়। সবুজ হারানো পুরবাসীগণ শেষযাত্রায় সামিল। খই আর শোক ছড়িয়ে পড়ে শহরময়। পৌরাণিক শোক ভুলে নাগরিকবৃন্দ ভরিয়ে তোলে মুদ্রাকলস। ধীরে ধীরে জিগির এগিয়ে যায় শ্মশানের দিকে। পেছনে কলস থেকে মুদ্রা পড়ে। শবযাত্রা হলেও লাঠি মেরে ধর্মমুদ্রা লুঠ হয়। দূরদর্শনের টাওয়ারের মাথায় বসে যুগলববন্দী ধুন ধরেছে নগদবণিক আর বিমুদ্রাকৈতর— আর কটা দিন সবুর করো। স্মৃতিময় কদমডাল নুয়ে পড়েছে জনপদের উপর। কেন যে বসন্ত এলেই যাদবকিশোরীরা জেগে ওঠে জাদুউল্লাসে। তাদের কোমরের ভাঁজে ছয়রিপু হেলে পড়ে। সুনামি এসে ধুয়ে নিয়ে যায় সমস্ত সফলমুদ্রা।

উজানকাতর

আমার পূর্বপুরুষেরা ভাটির দেশ থেকে এসে
আমাকে রেখে গেছে উজানে। সেই থেকে আমি
উজানকাতর। সেই উজানের পাহাড় আমার বান্ধব।
পাহাড়ের সঙ্গে গলাগলি করে আমার বেড়ে ওঠা
কড়ই বনের নির্জনতায় আমি ছবি আঁকি
আমার স্বপ্নবালিকার। নদীর চলাচলের সঙ্গে
তার অবিকল মিল। পাক দিয়ে নাচে আমার চারপাশে।
আমার স্বপ্ন তুলে নেয় তাকে বুকের ওপর।
ক্রমাগত চলে আমাদের ছদ্ম রাগারাগি,
তার সমস্ত মুদ্রা আমি জেনে যাই দৈনন্দিন অভ্যাসে।

প্রেমিক হবার মতো সাহস আমার নেই।
ঈর্ষাও অপ্রতুল।
আমি এগোতে পারি না তার করতলের দিকে
যে করতলে সূর্য ফুটে থাকে।
আমার ভেতরে জেগে পৌরাণিক অচলঘড়ি
আমার পূর্বপুরুষেরা ভাটির দেশ থেকে এসে
আমাকে রেখে গেছে উজানে। সেই থেকে
আমি উজানকাতর। তালপাতায় আঁকা আমার
প্রাচীন পৌরুষ অর্থহীন কীটনাশক ছড়ায় বারবার।

অবশেষে ভাসানের গীতবিতান বিধ্বস্ত বুকে ধরে
হেঁটে যায় স্বপ্নবালিকা। পায়ের মল কাঁদে জুমিয়া বিরহে
পাহাড়ের ঘরে খবর পৌঁছে যায়। থামে তার বাঁশি।
জুমজনপদে আমি একা যেন কতকালের পরবাসী।

শর্মিষ্ঠা পাল

পরিচয়

যুদ্ধক্ষেত্রে সবাই সৈনিক
পদবী ঢাকা আছে রণসজ্জার ঠিক নিচে
লোহার আড়ালে পোশাকের রং বেরিয়ে এলেই
বুঝতে পারবে পিতৃপরিচয় আমার
এর জন্য শব্দ ব্রহ্মের দরকার নেই
গুছিয়ে রাখো তোমার শর
পাঁজরে এখন অসংখ্য ব্যস্ততা
সামনেই অকালবোধন।

ধর্ম

যে আমাকে মৃত্যুচেতনা দেয়
আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ!
পারাপার ভেঙে ছুটে যাই কক্ষপথে
এক যোগহীন জীবনের খোঁজে

ধর্ম আমার একটাই
তোমাকে ছুঁয়ে থাকা
অতল বিশ্বে।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

ফিরে আসে অন্তর্লীনা

একটা পথ সেদিন তোমার বাড়ি থেকে হেঁটে হেঁটে আমার
বাড়ি চলে আসে। ঘর থেকে বেরুলেই পথ বলে দেয়
আর কতটুকু যেতে হবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, সীমান্ত
থেকে জম্পুই না তুলসীবতী থেকে এন আই টি,
কোথায়? আমার কোনো ঘর নেই, নিজস্ব উঠানে
বুকের ভেতর গড়েছি ঘর, পিঠে রেখেছি জানালা
কপাট, শব্দ দিয়ে গড়েছি ছাতিমতলা, সাক্ষী
একটা র‍্যালি সাইকেল এখনও চিলেকোঠায়
আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে তো জানে আমার
পথ চলা, প্রেম ও প্রতীক্ষা।

মত আর পথের মধ্যে তখন রাজনীতির লড়াই।
বেড়ে উঠলে ছেঁটে দাও, নড়ে উঠলে কেটে দাও।
সংগ্রাম ছেড়ে ক্ষমতার দম্ভে অহংকার যেন
বাসা বাঁধে। তারপর শরীরের মেদ
শরীরকেই একটু-আধটু করে গিলে খায়। অক্ষরে
অক্ষরে জরুরী অবস্থা। চিঠি খুলে
দেখা হচ্ছে কে কাকে
ভালোবাসে। ভালোবাসাও অপরাধ তখন।

ভাবতে ভাবতে এসব কথা
নেমে আসে নীরবতা,
তারপর—

ঘুম পেয়েছে, ঘুম
বৃষ্টি ছিল সন্ধেটা নিঝ্‌ঝুম
ঘুম পেয়েছে ঘুম।

হঠাৎ একটা ছন্নছাড়া নদী
নড়ে চড়ে হাঁটতে থাকে যদি
তুমি তখন পাল উড়িয়ে নায়ে

মন চলেছে নদীর পায়ে পায়ে
আমি তখন ঘুমের ভেতর আঁকি
তোমার চোখে উড়ছে ক-টা পাখি
মেঘের ওপর সোনা রোদের খেলা
সন্ধে কোথায়? ডাকল সকালবেলা

আমার মধ্যে রূপকথার এক মেলা।

তখন ইচ্ছে করে গ্রামের পথে হাঁটি
পা ফেলতেই চমকে ওঠে মাটি
নোলক ফেলে পালিয়ে গেছে
আমার সোনার গাঁ-টি।

গাছের ফাঁকে মেঘের আঁচল বেয়ে
চাঁদের মতো ভাসছে একটি মেয়ে
ঠোঁট দুটো তার টুকটুকে লাল টিয়ে
জোয়ার গেল হল না তার বিয়ে।
শিং ভেঙে সব পালিয়ে গেছে ষাঁড়
মাটি জানে কি যন্ত্রণা তার।
হাতের মুঠোয় ছোট্ট একটি খাম
খুলে দেখি রাবেয়া তার নাম।
সাদা কাগজ আর কিছু নেই লেখা
জানলা দিয়ে একটু শুধু দেখা
শ্যামলা শ্রীমুখ নূপুর পরা পায়
মৌরলা মাছ ঝিলিক দিয়ে যায়।

পাহাড় বেয়ে নামছে চোখের জল
ভাসছে জমি ভাঙছে জগদ্দল
জল যাচ্ছে একটি নদী এঁকে
শাপলা দুটি চোখ মেলে তা দেখে
ওড়াচ্ছে পাল বৈঠা টানে মাঝি
আমার সাথে যেতে কি তুই রাজি?
মন মজেছে ভাটিয়ালির গানে
ঢেউ কি জানে ভালোবাসার মানে?

ছুটছিল সে হন্তদন্ত
কে আজ তাকে ফেরায়
ভালোবাসা আটকে আছে
কাঁটাতারের বেড়ায়।

এপার এসে ছিন্নভিন্ন একলা কাটাই ঘরে
সকাল-সন্ধে মনপাখিরা আসাযাওয়া করে
দেয় কে চিঠি খামের ভেতর একটা নদী এঁকে
বর্ষা যেন ভাসছিল দেশ সাগর বুকে রেখে।
আকাশে নীল ঢালছে শরৎ বাজছে তুমুল ঢাক
রাবেয়া, না অন্তর্লীনা? বলব কেন, থাক!

তোমার চিঠি ফুল ফুটেছে গন্ধ ছড়ায় বেলি
দেশ ভেঙেছে তাই বলে কি দেশ ছেড়ে তুই গেলি?
বসন্তে আজ আগুন ছড়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছে
পাপড়ি যেন একটা দুইটা পালক পড়ে আছে,
কুড়িয়ে দেখি পালক সে নয় আমার কিশোরবেলা
আমার ভেতর খেলছ তুমি লুকোচুরি খেলা।

আকাশ তখন মাথার ওপর মস্ত একটা সাঁকো
অন্তরে সুখ দুঃখ নিয়ে নদীর মতোই থাকো।

তোমার চিঠিতে শব্দ ছিল জীবন দিয়ে গাঁথা
একটি দুইটি পাতা
আসছে এপার যাচ্ছে ওপার পিওন জানে সব
পাখির কলরব।

তখন—
দখিন হাওয়ায় তোমার বাড়ি ভাসছে গাছের ফাঁকে
লাল শাপলার পথ পেরিয়ে ছোট্ট টিলার বাঁকে
চৌচালা ঘর সামনে উঠোন, পাশেই বটলব্রাশ
ভরা ফাগুন মাস
হায় কী সর্বনাশ
পলাশ ফাগুন ছড়ায় আগুন হাঁড়ি বসেনি ঘরে

ঠিক তখনই কোকিল ডাকে বাগান আলো করে,
এ যন্ত্রণা ক-জন বলো বোঝে?
ভাতের জন্যে বেরিয়ে পড়ি টিউশনির খোঁজে।
তোমার তখন দুইটা দিঘি তিনটা মস্ত মাঠ
জানলা খুললেই বকুলতলা এবং দোকানপাট
শব্দে তখন আসাযাওয়া শব্দে বাঁধি ঘর
শব্দে শব্দে বেড়াই ঘুরে বিশ্ব চরাচর।

ভালোবাসা কেমন বাসা, হায় রে উদাসীন
জানলি না তুই রাবেয়া কে? অন্তরে কে লীন।

শেষটা তোমার চিঠিতেই ছিল ভেবে দ্যাখো আজ রাতে
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি খুঁজে পাবে ছন্দ ও পাবে সাথে।
কারো আছে শুধু ছক কাটা পথ কেউ বা ছকের বাইরে
উল্টো হাওয়া না বইলে কি এত কবি আজ পাইরে?
ভালো থেকো তুমি ভালো রেখো তুমি মাটি কি বলছে শোনো
ভুল হয়ে গেছে তাই বলে ফের ভুল হবে না কোনো?
মানুষ তোমায় ডাকছে দেখো পথে প্রান্তরে যারা
চলো না ওদের অন্তরে আজ রোপণ করিগে চারা
বড় হলে গাছ ফুলে ফলে ভরে আদর জানাবে তাই
চল্ না 'অন্ত' ছুটে দিগন্ত কোথাও হারিয়ে যাই।

হারাবো কোথায়, হারাবো কোথায় অসহায় ঘরে ঘর
চলো পাশে গিয়ে অন্তর দিয়ে জয় করি অন্তর।

হারাবো কোথায়
হারাবো কোথায়
অসহায় কত ঘর
চলো পাশে গিয়ে
অন্তর দিয়ে
জয় করি অন্তর।

সন্তোষ রায়

কাঠের জীবন কাঠের মরণ

ঘুমাইলে নৌকা আমি স্বপ্ন টল্‌টল
কামনায় বাসনায় জীবন সচল।
এক মা-র পেটে ছিল এক পাটাতনে
অধুনা রেখেছি বুকে অতি সযতনে।
নদীর ভাঙন পড়ে পদ্মের পাতায়
সেই জলে ঘুম ভাঙে জড়ায় আমায়।
কামনার সাথে সাথে বাসনাও আসে
একবুকে ডুব দেয় এক নিঃশ্বাসে।
যতবার পাড় ভাঙে ততবার ঘুম
স্বপ্নদোষে দেহ ভাঙে যমজ অসুখ।
কামনার রং দেখ জলেও নিভে না
বাসনা যে সুকোমল আগুন জ্বলে না।

কাঠের গলুই যেন আমার শরীর
বইলে পলায় মাঝি জলের গভীর।
জল নয় জল নয় চরে চল মিঞা
কামনা বাসনা ডাকে শুন কান দিয়া।
আমার যে কান আছে মাঝি সে কি জানে!
দুপুরে তারাগুলান আছে কোন্‌খানে!
চরে আমি যামু ক্যান্‌! আমি জলচর
স্থলে জন্ম ছিল বটে জলেই মরণ;
ভাসিলাম যবে আমি গোপন সে ঘাটে
লালিয়া ফিতায় তুমি উড়তায় বাটে।
আছিলাম আমি হইলদা ফুলে ভরা
কত পক্ষী থাকত যে শাখা আলো করা।
করাতের গান শুইনা প্রাণ যায় সখি
পুরান অঙ্গ ছাইরা নয়া অঙ্গ গড়ি।
তরঙ্গে তরঙ্গে দেহে আইল চেতনা
চক্ষুকর্ণহীন আমি জলের সাধনা।
কত বাঁক কত ঘাট কত নরনারী
সুখ দুখ কত ব্যথা প্রত্যক্ষ করি।

ভ্রমরের গান নাই মাছের নিঃশ্বাস
পাখিদের ডাক নাই ছলাৎ-ছলাৎ।
অরূপ জীবন বয়ে চলে যায় মাঝি
ক্যামনে যামু গো চরে সখি বল দেখি।

জীবন মরণ মাঝে আছে পঞ্চভূত
এক ভূতে আমি আর চারিপাশে স্রোত।
স্রোতের নাগাল পেতে হাল ধরে মাঝি
কোন্‌ স্রোতে যাবা তুমি আগে ভাব দেখি।
বৈঠায় মারে মাঝি জল-বুকে ছেদ
নিজেরে পারে না ছুঁতে এই তার খেদ।
দুই ধারে ধানখেত নদী বয় মাঝে
সকাল সাঁঝেতে নদী কতরূপে সাজে।
ভিতরে ঝিলিক মারে চাপিলার ঝাঁক
আসমানে চিল আর সাদাকালা কাক।
ঢেউয়ের কথা আমি সারাদিন শুনি
কলকল ছলছল কত তার ধ্বনি।
কামরাঙা পাখি ডাকে সজিনার ডালে
আমার গানের কলি ভাসে নীল জলে।
কেউ কয় ত্রিনয়ন কেউ কয় যোনি
কতরূপ পাই আমি, দেয় জ্ঞানীগুণী।
কোনো রূপে নই আমি কোনও আকারে
জনম মরণ মাঝে আছি পারাপারে।
উজান ঠেলিয়া যাই সুখদুখ লয়ে
পাপপুণ্য দুই বহি এপাড়-ওপাড়ে।
এপাড়ে-ওপাড়ে যত পাপ-তাপ জ্বলে
কামনা বাসনা মাঝে নদী বয়ে চলে।

কানামাঝি কালামাঝি কাষ্ঠ অঙ্গ মোর
তারই মাঝে যাত্রীর আলাপের ঘোর।
আঁধারে যতেক আছে দুই সারে বসে
কত কথা শুনি আর কান যায় খসে।
মিছার কাছেতে মিছা সত্য কথা কয়
হাচার কাছেতে মিছা মিথ্যা হয়ে রয়।

ঢেউয়ের শিশু ঢেউ, একভাবে যায়
ছোটবড় উঁচুনিচু এক চেহারায়।
যাইতে দেখি যে আমি আইতে দেখি না
তুমিও যাইবা ভাই ফিরা আইবা না।
যাইতে যাইতে ছল্ যত জাদুক্রিয়া
ঘাটেতে লাগিলে নাও পথ খুঁজ গিয়া।
লম্বা লম্বা শ্বাস পড়ে আন্ধার মাঝেতে
কবরের চিত্র জাগে চোখের কোণেতে।
জন নাই, নাও নাই একলার পথ
নিজ পায়ে চল তুমি নতুন জগৎ।
কারে ডাকো কারে খোঁজো কেউ নাই কাছে
বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই খালি চারপাশে।
আকাশের মাঝ থিক্যা পিছনেতে দেখি
মালাখানা ঝরে গেছে তুমি এক বাকি।
মরণেরে না দেখিলে কে কারে গো চিনে!
অপরের ধনে জীবন লও না কিনে!
কর্ম আর ধর্ম মাঝে নাই কোনো ফাঁক
থাকে যদি সে ফাঁকেতে হাঁটে যত পাপ।
মাঝির গান সে গায় আমি ভাসি জলে
আমার জীবন নাই বান্দা এক হালে।
পুড়াইলে পুড়ি আমি ভাসাইলে ভাসি
আগুনেও হাসি আমি জলেতেও হাসি।
হাসি ছাড়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়া হাসি
মাঝির গান সে গায়, আমি জলে ভাসি।

ছিলাম বাকলে ঢাকা বনের সংসারে
রঙেতে এখন কালা জলের মাঝারে।
পাকা ধানে মই মিঞা দিইনি কোনো কালে
বাকলের তল থিক্যা তবু ফেল্লা জলে।
কই মাথা, কই হাত কই পাও চোখ
মাঝখানে ভাসে শুধু পাতামের বুক।
শুখা বুকে ঢেউ লাগে কামনা রঙের
কত ইচ্ছা উত্লায়, কত না স্রোতের।
শিরায় শিরায় বাজে অতীতের গান
জনপদ, বনপথ, নিরিবিলি প্রাণ।

ধরমে ছিলাম আমি অপার সংসারে
ডুবিয়া ভাসিয়া চলি অকূল পাথারে।
মাঝি-কর্ম মাঝি করে নিজ কর্ম আমি
অনর্থের অর্থ খুঁজি 'জগতের স্বামী'।
দুইদিকে চিতা জ্বলে মাঝখানে পথ
বরাবর আসি-যাই জীবন যে-তক্।
আনাডাকে যাই না আমি ডানে বা বামে
মাঝি জানে ভালা কইরা কী তার মানে।
স্বপ্ন নাই ঘুম নাই ভিজা দুই চোখে
মরণের পরে আছি জাগরণ সুখে।
জাগরণে নিদ্রা যাই নিদ্রায় জাগন
অন্যথায় মরে যাই আসল মরণ।
হাজার বছর স্রোত বয়েই এলাম
মাঝির পর মাঝি কত যে পেলাম।
অন্নপূর্ণা পা রাখে বুকের ওপরে
কামনা-বাসনা স্বর্ণ হইল আহা রে!
কামনা হইল রাঙা সোনার পরশে
বাসনা হইল সাদা ভাতের রঙেতে।
ইহকাল পরকাল, যে কালই কও
সুখ নাই সুখ নাই পুড়ে রাঙাবউ।
আমার নাওয়ে তারে নিলাম গো ঘরে
চিতায় দেখিলাম তার বিভূতি যে উড়ে।
'হ্যাঁ'-র মাঝেতে 'না' ভাসে, 'না'-র মাঝেতে 'হ্যাঁ'
মনসা কানিয়ে চাইল চান্দের পূজা।
ধন গেল, জন গেল, সব গেল জলে
আমিও গেলাম লগে গাঙুরের তলে।
পিছনেতে আছে যত শ্যাওলার দিন
ঘষা দিলে মনে পড়ে আসে না সুদিন।
সোনার তরি গো আমি বেহুলা-মান্দাস
মহাজন মহাসুখ তিল ও কার্পাস।
কৃষক ভরসা আমি ঘুরি হাটে হাটে
ধান পাট মুগ নামে সব ঘাটে ঘাটে।
জলবেশ্যার গান শুনি মাঝি ও আমি
অসৎ-এর লুঙ্গি কাঁপে হাসে অন্তর্যামী।

সাত গাঁও এক হাট, শ-নায়ের ভিড়
মোল্লায় মূল্য করে নাচে বাউলা পীর।
পীরের পিছনে ছুটি, ছুটি ত্বরা করে
কানা বুক কানা চোখ ভালা কর মোরে।
পীর কয় ওহে শোনো, শোনো নাও-ভাই
তোমার বুকেতে কোনো কাঁটাতার নাই।
তাপ্পিতাপ্পা দিয়া মারা আমার পোশাক
জোড়াতালি দিয়া বাঁচো দুঃখ-এ না-যাক।
নদীর ভাঙন যদি নাই-বা থাকিবে
নতুন চরার বুক ক্যামনে জন্মিবে!

শুনিয়া পীরের কথা, ধীরে ফিরি ঘরে
কামনা বাঁচিয়ে রাখে দুঃখের সংসারে।
কিছু নাই তবু কয় সোনার তরি
অঘ্রানের বুকখানা সোনা দিয়া ভরি।
মহেঞ্জো হরপ্পা হয়ে কত হাট-ঘাট
নীলনদে ভেসে ভেসে পাথুরে পিলাক।
দেশে দেশে ফিরি আমি পাড়েতে সংসার
মালু-তাঁতী দুই ভাই, নেয় সব ভার।
মথুরা-বৃন্দাবন শেষে আগ্রার জল
এখনো খোঁজেন ফিরে প্রেমের গজল।
ধন যায় মান যায়, ভেসে থাকে মন
প্রেমকাঙাল মানুষ, মাটি যতক্ষণ।
থাইক্যাও মাটি নাই মানুষের তলে
আমার আছিল সব, আজ ভাসি জলে।
দিনেরাতে শীতে-জ্বরে জীবন আমার
আলো-আন্ধাইরে বই কুয়াশার ভার।
নাভির অতল থিক্যা একান্নের পীঠ
সর্ব অঙ্গে ধুলিমাখা রজঃ ফুলে স্থির।
জলের কিনারে দেখি যতেক সভ্যতা
দিবারাত্র জ্বলে যায় হরিশের চিতা।
পাল তুলে দেয় মাঝি আমার মাথায়
রাধিকা আঁচল যেন বাতাসে ওড়ায়।
কাব্যের নাব্যতা বাড়ে, গাঙে পড়ে চর
প্রেমে-অপ্রেমের গড়া, এ-ভূমির স্তর।

বিচিত্র চরার মাঝে জল তিরতির
অশ্রু যেন ভেসে যায় উজান-ভাটির।
নীল জলে প্রেম ছিল, কালা জলে বিষ
কালাকৃষ্ণ নীল জল বাতাসের শিস্।
শিরায় শিরায় ঘুরি, শেষে প্রতি অঙ্গে
নায়ের জীবন চলে, বাঁকা জল-সঙ্গে।
মায়ের বুকেতে এসে সব নদী মেশে
কাঠের সন্তান আমি, থাকি গর্বে ভেসে।
কুপি জ্বালাইয়া মাঝি রান্দা-ভাত খায়
জলে একা বান্দা থাকি, মাঝি ঘুম যায়।
দিনরাত খোলা থাকে একান্নের পীঠ
বুকে আমি লই তারে, যে হারায় দিক।
নদীর নামতা আমি উল্টাইয়া পড়ি
পরলোকের জীবন যে, কাঠের সিঁড়ি।
আমার নাকেতে আমি, বাইন্দা দেই দড়ি
টাইন্যা নেও আমারে, কামনা-সুন্দরী।
জল নাই, জন নাই, নাই নিজঘর
যার মাঝে বাস করি, সে-ই বলে পর।
বাসনা সাষ্টাঙ্গে আছে একান্নের পীঠে
নিজ জল, নিজে খুঁজি নিজের ভিটেয়।
ভেতরে-বাহিরে খুঁজে, শেষে নাভিমূল
অপার জলের ঘ্রাণ মাঝে এক ফুল।
দুই স্ত্রী, এক স্বামী ভাসে এক জলে
ঘুমাইলে স্বপ্ন যেন টলটল চলে॥

দিলীপ দাস

যমকুলির ডাক

জ্বর এসেছে ঝড়ের বেগে। বাউল বাতাস কই!
কম্প আসছে ঝম্প দিয়ে। তাতে কাবু নই।
ডাক্তার-বদ্যি আসছে যাচ্ছে রোজ। সবার মুখে
চিন্তার উজ্জ্বল ছাপ। এমন সময় সবার অগোচরে,
দরজা ধরে কে দাঁড়ালে বাপ! কানে কানে
বলল সে অশ্রুত— যাবে নাকি আমার সঙ্গে, বাহে,
একটু বেড়াতে? বললাম তেড়ে, ফাজলামিটা
রাখো দেখি ওহে, মরছি সন্নিপাতে। পা দুটো
দেখছ না ল্যাতপেতে! এমন রোগা পায়ে
হাঁটব কি করে? ভাগো দেখি এক্ষুণি
নইলে ডেকে আনব বদ্যিকে।

যেমন এসেছিল সে, তেমনি গেল চলে
সবার অগোচরে। আমি মরি সান্নিপাতিক জ্বরে।

এরপর জ্বর পালালো। বল বাড়ল।
সে কি যত্ন-আত্তি। চলি ফিরি, হাওয়া খাই
গায়ে লাগল গত্তি।

বছরখানেক পরে, সেই ব্যাটা আবার এল,
সবার অগোচরে। সাপ যেমন ঢুকেছিল
লোহার বাসরে। গোঁফ চুমড়ে
বলল ষণ্ডমার্কা, যাবে নাকি?
বললাম, কেন যাব? আমার কি যাবার সময় হলো?
সবে মাত্র তো ষাট পেরোলো। বলল বাঁকা হেসে
হয়নি বুঝি! আর কতকাল চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—
অনেক তো ধসালে। হাত দু-খানি বুকের কাছে রেখে আড়াআড়ি
বলল, গা ঝাড়া দাও। ওঠো। আমার সঙ্গে
চলো পায়ে পায়ে। আর কতদিন
পড়ে থাকবে বাঁয়ে?
দিলাম কষে ধমক। উঠল যেন গমক।

ফচকিবাজির জায়গা পাওনি বুঝি! ষাট পেরোলো!
চাঁদ উঠিল। এবার নতুন শুরু। ভাগো দেখি গুরু।
চোখের মাথা না-খেয়ে যদি থাকো,
চক্ষু মেলি দেখো চারিধার। আশি নব্বইর আগে
কেউ রা কাড়ছে না আর। পাশের বাড়ির
বুড়োকে চেয়ে দেখো, শালির সঙ্গে করছে কেমন র‍্যালা!
যাও না কাছে! বুঝবে তখন ঠ্যালা।
সবার চোখে পরিয়ে দিয়ে ঠুলো, কী সুন্দর একখান
সেঞ্চুরি হাঁকালো। বলো দেখি বাছা,
আমায় কেন টানছ ধরে কাছা? কাজ বুঝি নেই আর, তাই
জ্বালাচ্ছ বারবার?

সেদিনও চলে গেল সে। মনখারাপ হল বুঝি তার?
কোটা হয়তো হয়নি পূরণ, আহারে বাছার!
চাকরি গেলে খাবে কি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে?
তাই তো ইনিয়ে বিনিয়ে, আমায়
পটাতে চায়। ওরে ব্যাটা, আমি কি তোর জামাইবাবু?
আমার সঙ্গে কিসের এত ইয়ে...
যা, যারে যা কাওয়া, বিষের আকাশ দিয়ে।

বেনারসে গেছি বেড়াতে। ঘাটের পরে ঘাট
পেরোচ্ছি ষড়ঙ্গা নাও দিয়ে। মণিকর্ণিকা গিয়ে,
নৌকো থেকে দেখি ব্যাটা পারে,
হুতোম মুখে রয়েছে দাঁড়িয়ে। ধোঁয়ায়
চক্ষু দুটি লাল। আমায় দেখে হাসল মিটিমিটি।
চাকরি বড় বালাই! এ ভবের ধোঁয়া থেকে কারও মুক্তি নাই!
আগুনের জিভ আকাশপানে উঠছিল লকলকিয়ে।
ধূম্রলোচন হাসল আবার আমার
দিকে চেয়ে। বললাম ভীষণরকম রোষে, আবার এলে
মুখে নুড়ো দেব ঘষে। অমনি খুকখুক কেশে
মিলিয়ে গেল ধূপে। মনে মনে বলি,
একবার তোমায় হাতে পেলে চাঁদু,
বুঝবে তখন শিলনোড়ার কি যাদু, খেপে আছে সবে।

বছর কয় পরে, মনে বড় বিষাদ ঘনালো।

আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি নামে উদোম মাঠে একা।
কাটছে না রাতদিন। জগতের সবগুলো দিক মনে হচ্ছে ফাঁকা।
এমন করে কতদিন আর থাকা! মনের কথা মনেই ছিল চুপে,
তবু কী করে যে শুনে ফেলল চোর। চোখ সমুখে
এসে দাঁড়াল ব্যাটা ঘনঘোর। কৃষ্ণবর্ণ কালো গোঁফে
চুমরা দিয়ে বলল, মনে যখন মেঘই ঘনাল, এবার তবে
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয়ে ঝরো। চলো আমার সঙ্গে
পরিহুরির দেশে। দেখবে আপেল গাছে ঝুলে আছে কত রাঙা ফল।
ঝুলে আছে কত পুষ্ট নধরকান্তি বেল। সেথায় বুড়োগুলো
জোয়ান হয়ে দেখিয়ে যাচ্ছে খেল। যাবে যদি চলো।
নইলে ট্রেন ফেল। তেড়ে গিয়ে বললাম হেঁড়ে গলায়,
ভাগো দেখি খুড়ো, নইলে পাছায় দেব হুড়ো।

হুড়োর ভয়েই কিনা জানি না, সেদিনও সে দ্রুত পালাল।
এদিকে আমারও সত্তর পেরোল। ভাবছি ধীরেসুস্থে
রওনা দেব কলির বানপ্রস্থে। কিন্তু আমার যে
বৈরাগ্য সয় না। গুরুদেব তো বলেই গেছেন,
বৈরাগ্যে মুক্তি মেলে না। কী যে করি, কোথায় যাই!
রোজ বিকেলে পার্কে বসে থাকি। এককোণে একাকী।
দেখি, সুন্দরীরা আহা কেমন বেণি দোলাচ্ছে! বুকের কুসুম
ফুটছে ধীর লয়ে! তরুণীরা সাপটে ধরছে যুবা।
যুবাও তার ঠোঁট-পুকুরে ডুবে হয়ে যাচ্ছে বোবা।
ডোবাডুবি দেখে রোজ ফিরে আসি একা। চারিদিকে নৃত্য করে
আঁধার মরীচিকা। এমন সায়ংকালে, ও গুরুদেব,
আমারও যে ডুবতে ইচ্ছে করে!

সেদিন চৈত্রমাস। জুমের আগুন ঘোড়ার খুড়ে
নাচছে পাহাড় জুড়ে। আগুন-রঙা বসন্ত আজ,
পাহাড় জুড়ে হোলি, ঢাউস বুকের যুবতীরা
খেলিছে রঙোলি। সারা পাহাড় উথাল-পাতাল,
বেতাল আমার মন, আগুন শুধু চারিদিকে, আগুন সারাক্ষণ,
কৃষ্ণচূড়া পলাশ ফুলে, বসন্তের মাতন।
এমন সময় আগুন মেখে সে এসে দাঁড়াল। চক্ষু দুটি ঢুলু-ঢুলু,
বক্ষে মন্দার মালা, অনাবৃষ্টি চারিদিকে তার মধ্যে এই জ্বালা।
বললাম তাকে, আবার কেন এলে? বলল, তোমার জন্য

মনটা পুড়ছে বড়ো। কেমনে যাই ফেলে?
বলি, ভালো আছি রসেবশে। গোল কোরো না,
দেব কষে। সামনে থেকে সরো। চেয়ে দেখো,
ব্রাজিল কেমন গোল খাচ্ছে আরো। সামনে থেকে
সরো দেখি বাছা। নইলে ন্যাংটো করে
খুলে নেব কাছা। রেগেমেগে বলল কৃতান্ত—
হারামজাদা, তোর দাঁতের জোর তো বেশ। আর কত
চর্বচোষ্য খাওয়া? বললাম, ভালো চাও তো
এক্ষুনি হও হাওয়া। নইলে ডাণ্ডা নিয়ে করব পিছু ধাওয়া।
দাঁতের জোর এখন দেখছ কি! বত্রিশ ছিল, আটাশে ঠেকেছে।
চার দশকে একেবারে আনাম। আনাম বুঝো? আনাম মানে অক্ষত।
এসব কথা বুঝতে, হতে যদি ব্রাহ্মণবাড়িয়ান। এসব নয় কেলোর কলরব,
একেবারে খাঁটি দ্রাবিড়ান। কাম-কাজ আর নেই বুঝি হাতে,
তাই মরছিস ওরে হা-ভাতে? ঘুরঘুর আমার বাড়ির কাছে? পথের পাশে
ঘাস উঠেছে মেলা, যাও, কেটে ফেলো এইবেলা। মোষের খাবার হবে,
বোঝাই হবে ঠেলা। ঘাস কাটাব বলেই কি-না ভয়ে,
হুড়দ্দুম পালাল সে ধেয়ে।

আরেকদিন এসে কাঁচুমাচু মুখে, বলল,
আচ্ছা, তুমি তো একটা পুজো দিতে পারো।
বিফল মনে রোজ বিকেলে ফিরে যেতে ভালো লাগে কারো!
দাও না একটা পুজো। সবরি কলা, আঙুর, আপেল,
গামছাপাতা দই, আর ধামাখানেক খই!
চিড়বিড়িয়ে রক্ত উঠল মাথায়, তেড়ে বললাম,
সাহস তো তোর বেশ! ঘুষের লোভে
নাকাল অবশেষ! বেশি লোভ করবি না, বলে দিলাম তাই!
জানিস আমার মামা ঝানু সি বি আই।
সি বি আই! ওরেব্বাবা, বলে সেই যে পালাল,
বহুদিন আর দেখা মেলেনি তার।

আমার হল হ্যাপা! তাকে দেখলে মেজাজ চড়ে,
না দেখলে মনে হয় সবকিছুই ফাঁকা। মনে মনে ডাকি তারে,
ওহে গুঁফোভাই, কতদিন তোমার দেখা নাই।
তোমার দেখা নাই রে ওভাই , জীবন আইঢাই
জীবন বড়ো একা, তাহার আর কেউ নাই সাথি

এসো আমার সোদর ভাই, আঁধার পথের বাতি।
এসো আমার চাঁদু, গোকন্‌ঘাটের ইষ্টিকুটুম যাদু,
এসো আমার রাকা, জীবনপাত্র উছ্‌লে ওঠে
চাঁদ ফুটেছে বাঁকা। এমন রাতে সাধ জেগেছে,
তোমায় একটু দেখি, পথের মাঝে পথ হারাব,
আমায় ভুলে গেলে নাকি!

চাঁদ উঠিল, ফুল ফুটিল, সকল দুয়ার খোলা,
জোছ্‌না আসে হুড়মুড়িয়ে দখিন দুয়ার দিয়ে,
তোমার জন্য বসে আছি সখা, সকল কিছু নিয়ে।

তবু হায়, তাহার দেখা নাই, বটবৃক্ষে ঝুলছে রশি,
ঝোলার রসিক নাই। তাকে নিয়ে ঝুলব বলে
দুয়ারে বসে থাকি, ঝুলন গেল, হোলি গেল,
ব্যাটা পটল তুলল নাকি, আমায় দিয়ে ফাঁকি?

লক্ষ্মণ বণিক

গার্হস্থের ফানুস

খুঁজি
প্রেম পর্যায়ের তোমাকে।
সাজানো-গোছানো সাংসারিক পরিমণ্ডলের ভেতর
সত্যিকারের তোমার হদিস পাই না
যেখানে তুমি প্রেমিকার নির্মোক পাল্টে পরে ফেলেছ
গৃহকর্ত্রীর অমোঘ পোশাক
মা ও গৃহবধূ একাধারে
ঘরের স্বাচ্ছন্দ পরখে তোমার উৎসুকতা
মনে হয় দ্বিতীয় সারির আমি ঘরেরই উপকরণস্বরূপ
কখনো বসবার ঘরে, কখনো শোবার
চিলতে বারান্দায় রোজ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রাঙানো আভায়
আকাশের মতো সর্বাঙ্গে রাঙাতে থাকি
জীবনের নোনাস্বাদ অকাতরে মিশ্রিত কর আমার ভেতর
এমন রসায়ন বেশ রপ্ত করে ফেলেছ স্বল্প কাল ব্যয়ে
একজন সুপুরুষকে প্রতিনিয়ত জং-হীন স্প্রিং-এর মতো
সতেজ ও বর্ণময় রাখার কৃৎ-কৌশল
তোমার এমন স্বরূপ, দু-হাত তুলে বাহবা প্রাপ্য
অথচ, আমি প্রেম পর্যায়ের তোমাকেই সর্বদা কামনা করি

চা ভর্তি পেয়ালা আর সুদৃশ্য ঠোঁটের মাঝখানে যোজন দূরত্ব তোমার
মানা না-মানা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর
অতি সরলীকরণের পথে হাঁটা ন্যায় নয়
দূরত্ব দূরত্বকেই হাতছানি দিয়ে সহাবস্থানে রোমাঞ্চের মাত্রা বৃদ্ধি করে

অনেক পার জুড়ে গড়ে ওঠে এক এক অবয়ব
নদীর কেবল দুটো পার, একটি উৎস ও মোহনা আর
জননীর মতো সুসংহত বুকে উথালপাতাল এক হৃদয়
অথচ কোনো পার কোনো পারের অনুভবের কথা জানে না
কেবল একক বিন্যাসে ছলাৎছল জল বয়ে যাবার শব্দে মশগুল
আমরা বলি, নদীর প্রায় জীবন মানুষের, হতেও পারে; কিন্তু আমি দেখি
এক মানুষের কত কত দিক

এক এক দিকের কত কত মোড়, পারের পর পার
এরপরও পরপারের হদিস হাতছানি দিয়ে ডাকে কি ডাকে না
তাও হতেও পারে, আবার না-ও

নিজেকে দেখি না এমন কেউ কোথাও নেই
যখন দেখি ঠিক বেঠিক প্রশ্ন জাগে, শুধরাই বেঠিক মনে হলে
ঠিক ঠেকলে বাহবা দিই, পিঠ চাপড়ে বলি, সাবাশ! চালিয়ে যা
বেঠিকের ক্ষেত্রে মৃদু থেকে জোর ধমক, থাপ্পড়ও কষাই,
রাম গালি দিই নিজেকে নিজেই— শালা হার্মাদ! শুধরালি না!

সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, দিনের যে-কোনো সময়
একটু হাঁটা হৃদয়ের পক্ষে সুস্বাস্থ্যকর
যেখানে রিকশায় পা দিলেই দশ টাকা বিশ টাকা
সেখানে এক-আধ কিলোমিটারের জন্য নির্ভেজাল পদাতিক সাজা
অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কোনো গতি নেই, বৃষ্টির অপেক্ষায় নদী বসে থাকে,
মাটিও এক পশলা ধারাপাতের ছাঁট নদীকে উন্মাদনা উপহার দেয়
মাটিকে করে তোলে রজঃস্বলা।

এক নারী পিতৃস্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হতে হতে আবিষ্কার করে
আরো একজন ওরই অপেক্ষায় ভিন্নতর পরিকাঠামোয়
ওকে মারাত্মক টানে যার উপেক্ষার পাঠ অজ্ঞাত
কেবল সাড়া দিতে জানে যার উদ্দাম স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়
এমনই নান্দনিক প্রাকৃতিকতাসমূহ
সাতশো কোটি প্রাণে পুরোদমে বিদ্যমান, মহাবিস্ফোরণের কোটি কোটি বছর
অতিক্রমণের পরও আরো আরো কাল পাড়ি জমাবার ইচ্ছে বুকে
উৎসুক ঈশ্বর মানুষকেই তৈরি রেখেছেন তাঁর অদ্বিতীয় দোসরস্বরূপ
সবাই নন; কোনো কোনো মানুষ এমনই বোধসম্বল
রোজ সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে স্নান সেরে গলবস্ত্রে তাঁর প্রার্থনা সেরে নেন

বসত মূর্ত হয়ে ওঠে বসতির আহ্বানে, সে কথা
আর কেউ না জানুক কেবল জানা থাকুক সে একজন
অতি গোপন প্রেমিক প্রেম নিবেদন করেনি কখনো
অথচ প্রতিটি প্রয়োজন ছুঁয়ে আছে যাকে আপ্রাণ
প্রতিটি অবসরে ভিড়িয়েছে তরি সে ঘাটে, আশ্রয়

নিরাপত্তার প্রথম ও শেষ নাম যে নিজে থেকে
জানান দিতে আসেনি কখনো
এই প্রেক্ষিতের উপর ভর রেখে বসতিই বরং
নিটোল অবয়বে হিল্লোল টেনে সময়-অসময়
নির্বিশেষে সমুখে দাঁড়িয়ে পড়ে সটান—
কার সাধ্যি উপেক্ষার হাসি হাসে
তির্যক দৃষ্টি মেলে বসত প্রতি-উত্তরে সমর্থ না হলেও
নীরব দর্শক-শ্রোতার মতো গহীন গাঙের বুকে স্রোতহীন
জল বয়ে যাবার মতো বসতিকেই আঁকড়ে ধরে কাটিয়ে
দিতে ওস্তাদ কত জীবনের পর জীবন

ইচ্ছেটাই মূল শক্তি। সে-শক্তির গোড়ায় কল্কে ভরে দম দিয়ে রাখি
নল ঠোঁটে চেপে থেকে থেকে গড়গড়ায় শব্দ তুলে
জানান দিই আমার সজীবতা
তোমরা যে যা করবে আর ঠুঁটো জগন্নাথের মতো
অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেবে সে বান্দা এ অধম নয়
যে-ই হোক, কারোর চোখকে ফাঁকি দেয়া খুব সহজ নয়

যুগ বদলের দোহাই টেনে, যন্ত্রনির্ভরতার ধুয়া তুলে
দিনকে রাত রাতকে দিনে পর্যবসিত করা
দেশ-বিদেশ, ঘর-বাহির বলে পৃথক কিছুই অবশিষ্ট রইল না
বিশ্বায়নের নামে পরতে পরতে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর শিল্প
কোনো বিষয়ে তিল পরিমাণ অসতর্ক হলেই কান টানলে মাথা আসার মতো
হুড়মুড় ভেঙে ছত্রখান তাসের দেশ। পোড়া মুখ লুকোবারও জায়গা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর
অথচ হাতি মরে গেলেও লাখ টাকা।

ঝগড়ার নামগন্ধও নেই, অথচ জমে উঠেছে হিমালয়প্রমাণ অভিমান
ব্যাকরণ মেনে সব হয়, মায় সঙ্গমও যন্ত্রের মতো
অথচ রামশূন্য পরিতৃপ্তির বিবর
দশ-দশজন দশ-দশরকম পর্যবেক্ষণ সেরে নেয়
দুধে ময়লা পেলেও আমাদের আকার-বিকারে ত্রুটি আবিষ্কার ভার
অথচ, নিত্যনৈমিত্তিকতার হাট পেরিয়ে
সমস্ত তন্‌মন ছলকে ওঠার সে পরিমণ্ডলের নাগাল দুরূহ

বেলার পর বেলা পঞ্চ উপাচারে সাজানো আহার্যের থালা
উদর হয়ে উঠছে টৈ টম্বুর

মন পুড়ছে কোথায় বরং হৃদয়ে তুষের আগুনের মতো হাহাকার
প্রত্যাশা মুখ মেলে নিয়ত, কমবেশি পূর্ণও হয়
সেইমতো গায়ে-গতরে স্পষ্ট হয় বেড়ে ওঠা ছবি
সাত রং ছড়ায় শতমুখে, ছড়িয়ে পড়ে অপছন্দের কণাও
কেবল আলোয় আলোয় ভরা ভুবন কজনের কপালে জোটে!

শুভেশ চৌধুরী

প্রেরণা

অন্ধকার পার হয়ে এই ঘর
সীমার বাঁধন,
কবর থেকে আলোর প্রাণ
জীবন পেল আলোয় আলোয়
চাষি দুঃখী, প্রেমিক সব।
যারা করে শবের দাহ
পবিত্র অনুগামী
তাঁদের ভালোবাসা পাপ পুণ্য
আজ নন্দনসমগ্র।

বন্ধন আজ প্রাণ
কোষ কোষের মিলন
আহ্লাদ

ভীষণ প্রতাপ এক অন্ধকারের
মুষলপর্ব ও
অনেক সমীকরণ তার
দ্রুত ত্বরণ ওই আলোর দিকে।
মিথ্যা
অন্ধকার হতে অর্ধ বা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত
সকল ব্যবধান
ধান ও মাতা অনন্তে এক বলয়যান।

বন্ধু বলেছে
ঘাস, আগাছা কীটকে করেছে জয়
জয় জয়কার তার
ভয় পায় না
এই অমৃত, এই ঔষধি

তীর্থ ধুলির মাঝে
ঝুঁকে আছি অসংখ্য চরণে
তাঁদের পদক্ষেপ
দূর পৃথিবীর দিকে
শান্ত হয়ে আছে সেখানে অপেক্ষা
মিটেছে তৃষ্ণা

স্বপ্ন দেখি না, পাপ মনে হয়
তার চেয়ে ভালো
অন্ধ করে দিও চোখ

অমল, তাঁর পঙ্কের শরীর
কি হবে আর পার্থক্য ভিন্ন নামে।
মাতা অনেক কিছুই গোপন করেছেন পিতার
সম্ভব হয়নি মুছে দেওয়া
অকিঞ্চিৎ সরল গঙ্গামাটি

দেশে দেশে যারা প্রতিরোধ গড়ে
বিরোধ ওই অবিবেকের সাথে
উন্মুক্ত করে জানালার পর জানালা
আকাশ, সমুদ্র পর্বত।
সীমাহীন আমি
ক্লান্তিহীন অভিযাত্রী
অনেক ফুল আজ পৃথিবীর চাই
চাই তারার আঁখি
প্রেরণা আজ রক্তে
শিমূল, পলাশ, কিংশুকে
আমি ভালোবাসি! আমি ভালোবাসি!

মাধব বণিক

হৃদমাঝারে

তার যেন পা চলে না
কার যেন চলে?
কচ্ছপের অলস পায়ে পা জড়িয়ে
সূর্য গা ডোবাচ্ছে
জলে তার ছবি ভেসে ওঠে
জলে তার নগ্ন পা কী যেন খোঁজে!

আমাদের ভারি পিঠে কে চাপায় বোঝা?
অন্ধকারে ছায়া দেখি না
তারাও ভীতু,
শরীরেই জবুথবু ঘাপটি মেরে থাকে
তার তবু আসা চাই
কোদালির দুপুর যেন
খিদে আর ঘাম মাখামাখি
কাঁধ বদল হয়,
পিঠ একটাই। তাই...

ঋতুর টান তার নেই
তার গমন বর্ষার কেঁচোর মতো
বর্ষার গর্ত থেকে সে এগোয়
কোথায় জানা নেই
জানে, যেতে হবে
এই উপত্যকা বাসযোগ্য নহে
তাই যেদিকে পা সেটাই দিক
অন্য কিছু নয়
পরিচিতির এত বহর
গমনে সব ব্রাত্য
একাই গমন
একাই নিত্যদিনের সূর্যাস্ত
একা একা সব মনোহরণ
পাশেই ঝুঁকে আছে অপমান

এভাবেই দিন এভাবেই রাত
সংঘাত উল্লাস আর সহমরণ।

ভোরের কুয়াশা এসব বোঝে না
বাতাস হয়েও সে নিরুচ্চার
আলোর গায়ে হাওয়া হতে মন্দ কি!
সবাক পাখিটি অনেক ভাবে
গাছের সাথে তার সখ্যতা আছে
তবু ঝড় বইলে
সে জানে, কেউ সাথে নেই
তেলহীন প্রদীপ যেন
সবাই কাঁপে, সেও
গার্হস্থ্য আগলে কিছুক্ষণ শেষ চেষ্টা তার
তারপর একা
এ-ডাল সে-ডাল
সূর্যাস্তের আগে পরে সবকিছু ক্ষয়ে যায়।

মৌসুমী ফুলটি জানে
এই আকাশ এই বাতাস এই আলো-অন্ধকার সব তার
আসলে কি তাই?
মাতাল গন্ধটি একদিন নিঃশেষ হয়
বৃদ্ধ কাক ঠোঁট ভিজিয়ে জিরিয়ে নেয় একপল
তারপর সব নিরাকার
এমনই তো ছিল সব
এমনই তো থাকার কথা
বিভূতি লাগানো রঙ লেগেছিল চোখে
তাই এত জল
তাই এত ভয়
তাই প্রতিদিন সাবান-ধোয়া নিঙড়ানো শরীর
তাই প্রতিদিন হারিয়ে যায়
প্রণয় পরচা স্বাস্থ্য বীমা

গোপন প্রস্তাব কিছু ছিল?
কতদিন? কার কাছে?

শরীর না মনের? নাকি অন্যকিছু?
আঁধার নাকি আধার? কোথায় তার বাস?
তার প্রতিচ্ছবি দেখি জলে, আয়নায়
চোখে দেখি বদলে যাওয়ার রং
হত্যা কোনো প্রতিষেধক নয়
অথচ ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুনাদ ভেসে আসে
কেউ ভাসে উগ্রচাঁদের হাতছানিতে
কেউ রক্তে কিংবা সফলতার দুর্বল গাথুনিতে
কিন্তু প্রস্তাবগুলো গোপন ছিল
অথচ শিকড়ে-বাকড়ে বেড়ে গেল মাথা ছাড়িয়ে

এভাবে জীবন এগোয় নাকি পেছনে ধায়
ভুলের মাসুল ঠিক কতো, জীবন জানে
চঞ্চল শেকল শুধু অবুঝ
তার ইতিহাস সবাই জানি, মানি না
ঘাপটি মেরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে
তিনদিক বন্ধ, পাথর কাঁদা দুর্গন্ধ
একদিক ডাকে, জানি আলেয়া
দরজা খুলে সেইদিকেই পা হাঁটে
পাণ্ডবেরা এভাবেই শেষ হেঁটেছিল
তবু চোখে আলো ফোটে, দূরে
বিচ্ছুরণ ঘটে,
পতনে নিঃস্ব হয় না কেউ

শেয়াল ডাকে, ভোর হয়,
চোখ জাগে
হৃদয় উপচে কার যেন ইশারা চমকে দেয়
পড়িমরি ঘুরে আসি সরষে খেত
পাগলা হলুদ চোখে লেগে থাকে
পায়ে পায়ে সে ডানা মেলে
আর জড়িয়ে পরে ভালোবাসায়
সে মাঝে মাঝে চমকায়, হাসে
গান গায়, পা ঠোকে
অকারণে কথা বলে পাশের বাড়ি।

ক্রোধ হয়, ভস্ম করতে ইচ্ছে হয় পৃথিবী
পৃথিবী ঘুরতে থাকে
অমাবস্যা চটকে দেয় পথ।

হাহাকার শেষ হলে
অজস্র মানুষের গায়ে মিশে যায় সে
আলাদা আকৃতি নেই, অস্তিত্বও নেই
সে মানুষ ছিল, থাকবে
দিনান্তের বুটিক রেখে যাবে সৃজনের নামে।

অলক দাশগুপ্ত

রাতপরির গল্পগাছা

আবার ডাকলে পরে চলে এসো যে-কোনোদিন
সর্ষেবীজতলা ছাড়িয়ে ঝুপ্‌সি বাঁশঝাড়ের নিচে
শ্যাওলা পুকুরঘাটে মনউদাসী দিনে
আবার হঠাৎ যদি ডাকি হিম হিম কুয়াশার দিনে,
দীঘলবাঁকের অস্ফুট ভোরে, রানিবাড়ির সবুজ বাগানে
আবছা অবয়ব বাতাসে ছড়িয়ে বহু বহু দূর থেকে
তবু একা একা চলে এসো...

সান্ধ্য আজানের ডাকে, সাঁঝবাতির রহস্য আলোয়
আমি ডাকলে পরে তুমি এড়াবে কীভাবে?
কেটে গেছে কত কত দগ্ধ দিন, পোড়া ঘরের বারান্দায়
ঝিম মেরে বসে প্রজাপতির ডানার রং দেখে দেখে,
ভুলে যেতে চেয়ে বিপুল আক্রোশ আর অন্তহীন ভয়
চেনা চেনা হাহাকার কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে
এত পাপ এত এত পাপ জমা ছিল বুকের কোটরে!
এত এত ঘৃণা লিখে রাখে এ-মানুষ ও-মানুষের চোখের মণিতে!

কারা রাতঘুমে বুকে খুঁড়ে উপড়ে নিয়ে যায় হৃৎপিণ্ড
দু-হাতে গর্ত ঢেকে এলোমেলো পায়ে পার হই কত
বন-ঝরনা-নদী-পাহাড় আর পোড়া পোড়া শহর-বন্দর-গ্রাম
হৃৎপিণ্ড এবং বিশ্বাস হারানো মানুষ বা প্রেত এক আঁধারবিলাসী
তুমি নেমে এলে জুম-টং থেকে, খাকরুন খেতের পেছনে
সুয্যি ডুবে গেল তখুনি, পেছন পাহাড়ের ওপারে নিমেষে অন্ধকার
চরাচর, মত্ত হাতি আর বুনো কুকুরের দল, কুমিরের খাল
তারও বেশি ভয় আরও বেশি ভয় মানুষ জন্তুটার...
আচমকা অন্ধকার চাঁদোয়ায় একে একে জেগে ওঠে জোনাকির আলো
খুম্পুই সৌরভে মাতাল হয় কুহক বন... তুমি নেমে এলে জুম-টং থেকে
খাকরুন বনে যেভাবে প্রতিবার ফিরে ফিরে আসে ক্রিস্‌মাস ক্যারোল
তারা হয়ে ফুটে ওঠো শীতের আকাশে অভ্রকুচির মতো সফেদ উজ্জ্বল
আর আমি ভুল করে প্রতিবার নামে ডাকি— বেথেলহ্যাম স্টার
এসো দু-জনে দাঁড়াই পাশাপাশি এই ছমছমে কুয়াশার জমাট অন্ধকারে
জন্মঋণ স্মরণে যাবতীয় ভুল এবং পাপ এই আকাশের নিচে ফেলে ফিরে আসি
অন্ধকার ক্রম গাঢ় হয় জেগে ওঠে পুরুষ্টু ঠোঁট, প্রেমিকার নাজুক স্তন,
আঙুলে আঙুল, পদ্মমধুপান, শীৎকার ও স্খলন, উজাড় করে ভালোবাসা
পাশাপাশি শুয়ে থাকি তৃণশয্যায় বনজ্যোৎস্নায় এ তেপান্তরে
তুমি উঠে বস প্রাচীন ডাইনির মতো দু-হাতে দুই জাদুডালা নিয়ে
উড়ে চলে যাও দূরে দূরে বহুদূরে অনেক উঁচুতে
আকাশের অচেনা এক তারা হয়ে যাও...

এত এত তারা আজ আকাশে, আমি যে জন্মান্ধ তালকানা
ধ্রুবতারা হারিয়ে ঘূর্ণিতে হাবুডুবু খাই, পানসি ভাসাই
ঘোলা জল দু-দিকে কচুবন ডিঙ্গি বয়ে যায়...জীবন এগিয়ে যায়
এক আকাশ তারা ঝিকিমিকি উতলা বাতাস
আমায় নিয়ে ভাসে কলার মান্দাস, বেহুলার শ্বাস, কোন্ জন্মের মধুমাস,
চারদিকে জল থৈ-থৈ, অশরীরী হাত, নিশিডাক, আলেয়া, কানাভূত
জটিবুড়ি জলে চুলের ফাঁদ ছড়ায়, ডিঙি ছুঁতে চায়
আরও কারা যেন মানুষেরই মতো ছায়া ছায়া কায়া,
মাঝরাতে জাল ফেলে মাছ ধরে, তীরের পোড়ো রাজবাড়ির নাচঘরে
আচমকা দপ্ করে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতি, নূপুরের নিক্কণ, আজও
কোনো কোনো রাতে সময় হেঁটে হেঁটে চলে যায় ভিন্ন সময়ে
ডাহুকের ডাকে বুকের রক্ত ছল্‌কে ওঠে, অভিশপ্ত ঘাটে

জল থেকে উঠে আসা যুবতীর শাঁখা পরা হাত চুপিচুপি ফিরিয়ে দেয়
প্রতারকের উপহার স্বর্ণ অঙ্গুরীয়, অজানা ভুবনের নদী বয়ে যাই
তুমি নেমে এলে ছায়াপথের সিঁড়ি বেয়ে রাতের শেষ প্রহরে
আমার শরীরে মদ, বড়ো জ্বর জ্বর, তুমি ছুঁয়ে দিলে আঙুলে আঙুল
যাবতীয় অসুখ সেরে যায়, কপালে রেখেছে হাত উত্তাপ শুষে নাও
সুখ বড়ো সুখ আজ, ঘুম ঘুম ভাঙা চাঁদ, নাওয়ের গলুইয়ে
রূপকথা নেমে আসে, সোঁদা গন্ধ মুছে নদী পদ্মসৌরভ বিলায়,
দুই তীরে শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর বেজে ওঠে, ধানক্ষেত জ্যোৎস্নাস্নান করে
কোজাগরী রাতে লক্ষ্মীর পাঁচালি সুর করে পাঠ শুরু করেন কথকঠাকুর
তুমি মাঝে মাঝে চলে এলে এমনই সব ঘটনাকে স্বাভাবিক বলি...

মজাপুকুর, খাঁখাঁ বাঁশ, ভূত-ভূতুনির জলা, অভিশপ্ত জলমহল,
শুনশান পুরোনো ডাকবাংলো, কুকুরডাকা অন্তরীপ, শনচুলো বুড়ির ছায়া
বেপথু কুবাতাসে আকালের কালো মেঘ হয়ে জমে থাকে দুর্গের উপর
যাবতীয় পতনের পরও কোনো ড্রাকুলা দুর্গ একা দাঁড়িয়ে থাকে
দুশো বছরের অত্যাচারের চিহ্ন সগর্বে বুকে সেঁটে আমাদের শোনায়
উপকথার ডাইনি বাবা ইয়াগার গল্প আর ঘাসের উৎকট মদের জয়গাঁথা
কিছু কিছু মানুষ আজও ভুল করে এই পোড়ো দুর্গকে ঈশ্বরের আবাস জানেন
মাইলের পর মাইল ঢুলিচোখে জন্তুর মতো হেঁটে যাওয়া ছাড়া
এক আস্ত জীবন নিয়ে তারা কিছুই করেননি কেবল একই পথে
হেঁটে হেঁটে ফিরে গেছেন নিজের কোটরে, দুর্গের বন্ধ দরজায়
ভক্তিভরে বেঁধে এসেছেন লাল তাগা গড় হয়ে মানত করেছেন
—আমার সন্তান হয় যেন সরকারি চাকর...
ভোঁ-কাট্টা চাঁদিয়ালের মতো আচ্ছে দিনের স্বপ্নেরা দূরে চলে যায়
দু-পশলার পর আকাশে যদি রামধনু ওঠে কোনো এক বিকেলে
জানি আমি তুমি এলে সাতরঙা জামা পরে আর তখুনি সে কী পাগলা বাতাস
দুর্গের ওপরে বিপন্ন রং-জ্বলা পতাকা ভয়ে থরথর কাঁপে
বোবা জন্তুর খোলস ছেড়ে সেইদিন মানুষের মুখে মানুষের ভাষা ফোটে
বন্ধ সেগুনকাঠের দরজাটায় লাথি মেরে বলে— ফোট্ শালা।
রামধনু হয়ে এলে প্রতিটি মানুষ জেনে যায় অনুবাদের ভাষা...

এভাবেই প্রাইমারি স্কুলপথে দেখা দুই শালিখ
বসে-আঁকোর প্রথম প্রাইজ রং-তুলি আর ঝলমলে সোভিয়েত বই
ডাকে আসা নীল খাম প্রেমিকার নাম তীব্র এস এম এস

ধুধু মাঠ দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে চলে যাওয়া এক রেলগাড়ি
শৈশব-কৈশোর উপড়ে নিয়ে চলে যায় অচেনা দেশে
আমি যদি চলে আসি যে কোনোদিন, এসে দাঁড়ালেই, এসে দাঁড়ালেই
সময় থেমে যায়, উল্টোদিকে বনবন ঘোরে ঘড়ির কাঁটা
পেন-ট্যাব সরিয়ে আমি হাতে তুলে নিই রং পেন্সিল
বাতিল কাগজে ফুটে ওঠে কবেকার স্কুলঘর, মিষ্টি দিদিমণি,
রাশভারী হেডস্যার, কেমিস্ট্রি ল্যাব, সরস্বতী পুজো আর
শাড়ি পরে আচমকা পরি হয়ে ওঠা সহপাঠিনী,
কাঠি আইসক্রিম আর তেঁতুলের আচার, ভিজে ভিজে দিন,
বুড়ো দপ্তরি রঘুদার পুরোনো ঘন্টা কেবল আজীবন বেজে চলে...
ঢং...ঢং...ঢং...

শক্তি দত্তরায়

আগুন আমার সবটা খেও

সকালবেলায় মনটা মুছি চোখের পাতা ভিজিয়ে নিয়ে
ঝকঝকে মন ইচ্ছে করে ঝরঝরে থাক রাত্রি ও দিন
একটু পরে কেমন করে হালকা ধুলো ছড়িয়ে পড়ে
মন-মুকুরে, আঙুল বোলাই, ছবিগুলো এমন করে
তাকায় জানো কষ্ট লাগে।

ভেজা চোখের পল্লবে রোজ মন তো মুছি, এই ছবি তো
রং ডোবানো জলছবি নয় কালের পাতে খোদাই করা
জীবন ছবি, হাসির সোনায়, রাগে রসে অভিমানের
মুক্তো-প্রবাল ফ্রেম বাঁধানো— কখন কবে নদীর চরায়
ঝাউবীথিতে, নীরমহলে, তাজমহলে। উঠোনের ওই
তুলসীতলে, হলুদ মোছা শাড়ির আঁচল, বাচ্চাকোলে
রান্নাঘরে। কান্না আসে।

আগুন তুমি খেলবে যেদিন আমায় নিয়ে ফেনিল চুলের
গুচ্ছ নিও, তসর শাড়ির আঁচল নিও। বিভঙ্গময়
অঙ্গ ছুঁয়ে নৃত্য কোরো, মনটাকে নয় ছাড়ান দিও।
অশথ গাছের হলুদ পাতা হাওয়ায় যেমন উড়তে থাকে
উড়িয়ে দিও। ধূসর রঙের আবছা ছবি থাকুক এখন
যেমন আছে। আগুন আমায় পুড়িয়ে নিয়ে সবটা খেও,
অশথ পাতার মতোন আমার মনটাকে নয়, ছাড়ান দিও।

দুরন্ত মাছেরা

দুরন্ত মাছেরা সারারাত পাহারা দেয় জ্যোৎস্নার জল।
নিদ্রালু পরিরা সে-কথা জানে
চুপিচুপি তাই নক্ষত্রের পিঠে চড়ে
খোঁপা বেঁধে নেয় জলতলে।

পরদিন শহরে শহরে রটে যায়, চাঁদ আসন্নপ্রসবা।
গ্রহণের ছলে মুহূর্ত ছুঁয়েছে কুমারীচরের ঠোঁট
এবছর পৃথিবীও স্বয়ম্বরা হবে, আমাদের
অগুনতি লিপ্সার ছায়ায় দুরন্ত মাছেরা
আঁকাবুকি শেখাবে ঘুমন্ত পোনাদের।

সামান্য

আলোর ঝালর থেকে চুঁইয়ে পড়ছে অন্ধকার
ঝরনার জলে খন্ডিত কাঁচের নকশা
তারা গান করে না।

অনেকদিন বসোনি কাছে
পরোনি কটকি কাজের শার্ট।

আজ যদি চলে আসো—
আলতো আঙ্গুলে ছুঁয়ে থাকো আংটির মুক্তো বিন্দুটুকু

এটুকু কি বেশি চাওয়া হল?

নকুল রায়

মানুষ ছাড়া দেবালয়

শুধু দাঁড়িয়ে আছি প্রান্তরে—

ধর্মের জামা খুলে মুছে দিয়েছি
দেবালয়ের সিঁড়ি—
ভগবান বসবেন সিংহাসনে।

আলাপ-আলোচনায়
মানুষ ব্যক্তিগত সুখ অনুভব করে;
সেই সুখের ভেতর নালা-নর্দমা থাকে;
আমি দেখি— সমুদ্রের বিশালতাও জাগে
কারো-কারো হৃদয়ে;
নর্দমার শরীর যদি পরিচ্ছন্ন না-হয়
তাহলে সমুদ্রেও যাওয়া সম্ভব হয় না।
ধর্মের আকাশেও মেঘ জমে, বজ্রপাতের
ভয়ে কেউ-কেউ ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকে;
ঈশ্বরকে যে-নামেই ডাকো—
ঈশ্বর তোমার নামে তোমার পদবী ধরে
ডাকেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।

আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রান্তরে—
মাকে ডাকলাম, মা এল
বাবাকে ডাকলাম, বাবা এল
ভাই-বোন-বন্ধু আমি যাদের নামেই ডাকি,
সাড়া মেলে;
মৃতরা এতদিন পৃথিবীতে আশ্চর্য বেঁচেছিলেন,
তারাই বেঁচে থেকে খাদ্যের বীজ বপন করে আমাদের
বাঁচিয়ে গেছেন কতদিন—
আমি সেসব ভোগ করি আজ।

যে-কোনো ধর্মের মানুষ ঈশ্বর তাদের ব্যক্তিগত;
যে-কোনো মসজিদ-গির্জা-দেবালয়ের
সিঁড়ি যদি তুমি নোংরা করো

সেসব পরিষ্কার করার জন্যে
কোনো ঈশ্বর আসেন না;

ঈশ্বরের জামাকাপড় ধোয়ার জন্যে
ঈশ্বরের দেবীরা আছেন;
কিন্তু হিংসায় আক্রান্ত মানুষজনের
রক্ত মোছার জন্যে— মানুষ ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই।

তুমি আছো

পাঁজরে হেঁটে যাওয়ার শব্দ টের পাই—
অন্তঃকরণে ক্ষয়ে-ক্লান্ত, তবু তুমি সুধা;
হৃদয়ে প্রত্ন হাওয়ায়, নির্জন ঘুম ফেলে
তুমি শুধু বিষণ্ণে ক্ষুধা। এই দেখাটুকুই
না-দেখার পুনর্সংস্করণ চাই।

নীল একমাত্র আকাশ নয়, মনের পুনরুত্থান—
পাঁজর খালি করে যে-মানুষটা হারায়,
তার জন্যে বেঁচে থাকি
প্রতিদিন ফিরে আসা লাজুক পদশব্দের।

কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

জানালা

এইসবে ধুনকর উটের শিরার সুরে পাড়ায় নামিয়ে গেল শীতকাল,
রোদের আরামে কেউ হৃদয় তাতিয়ে যায়,
পাখিসব ডেকে ওঠে জানালার পাটে বিনা অনুমতিতেই।
স্বাস্থ্যের বারতায় ডেকে ওঠে খাচি-ভরা টাটকা সবুজ
কমলার টাল নিয়ে সাইকেলে ফিরি করে রতনের বাপ
পাশেই প্রেয়াররুম ভোরের মহিমাগানে মুখরিত হয়।

পুবের আকাশ বলে আমিই প্রকাশ;চোখের গহীনে থাকি জ্ঞানের সূচনা,
উত্তর বলে, আমি হু হু অম্লজান, সাগরের কাছ থেকে বহুকষ্টে পাওনাটা আনি,
দক্ষিণ বলে দেখো, তড়পানি নাই আমি একালে নির্মল,
অমোঘ সত্যের ভারে পশ্চিম তলিয়ে যায় জীবনকে ধূপ-দীপ দিয়ে।

দুঃসহ স্বরে বাজে নাম-কীর্তন,
বাজারে বাজারে হল্লা, মাইকে-বাইকে পাড়া গমগম।
গভীর রাতের সুরে টাল খায় কীর্তনীয়া, ঘুমের নেশায় ধরা গলা।
শিশিরের ঠান্ডায় জমে যাওয়া বাঁশরীর মাঝে মাঝে খেপে ওঠা শুনি
ধর্মীয় দূষণ মেপে আকাশে তাকায় কোনো বিজ্ঞান-মন
ওজোন স্তরের দিকে দু-কলি ছান্দোগ্য ছুঁড়ে শোধন করেন।

এইবার শীতকাল দরিদ্রভারতীর সাদা-কালো পথে ডেকে যায়
বিনা উপদ্রবে হাঁটে জেব্রা ক্রসিং পার হয়ে
জেব্রা ক্রসিং নাকি মুখে চুন-কালি কাল টের পাওয়া যাবে
আপাতত শীতরাত মনুষ্য-খোঁয়ারের তালমিল ঠিকঠাক রাখে।

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

তোমায় দেখি

আমায় চেনে পৌষ বিকেলের ইচ্ছেকুটুম
বাসস্টপে রোদ নামতে গিয়েই ভাঙছে সিঁড়ি,
এসো না কাল দুপুর নাগাদ মেঘলা নিঝুম
দুজন মিলে পৌঁছে যাব উদালগিরি।

বুকের ভেতর মেঘ গুড়গুড় বৃষ্টি হবে,
আমরা সবাই অরক্ষিত স্বপ্নবেলায়
উপোস করে চুল ভিজিয়ে কি লাভ তবে,
সুযোগ এলে হারিয়ে না যায় হেলায় ফেলায়।

আমরা যারা দুঃখকাতর নেশার ঘোরে
গভীর রাতে জানলা খুলেই আকাশ দেখি,
যখন শহর ঘুমিয়ে থাকে, গলির মোড়ে
পাগল খোঁজে শ্বাপদ রাতের আসল-মেকি।

ফিরিয়ে দেবে? দিতেই পারো ইচ্ছে যখন
আপন পরের মধ্যিখানে এই তো ভালো
কুড়িয়ে পাওয়া সমাদরের শব্দচয়ন
চলে গেলেই নিবিয়ে দেবে ঘরের আলো।

হিরণ্ময়ীর ঘুম ভাঙে আজ রাধার নামে
ছাদের ওপর কে মেলে দেয় সিক্ত বসন?
বাঁচার শেকড় হাত মেলে দেয় নগর-গ্রামে
রাত পোহালেই তোমায় দেখি যখনতখন।

আমার দুপুর

দু-দিন আমার জ্বর হয়েছিল, তোমার বিবরণ
আমার মুখস্থ হয়নি।

মেগাস্থিনিশ তুমি খুব ভালো, বীজাগার পেরিয়ে
জল শুকিয়ে যাওয়া নদীর পথে হেঁটে যাচ্ছ
নাটঘর, মীরপুর, তুলাশিমূলের সাঁকো পেরিয়ে
কোথায় যে চলেছ একা একা,
জাফরান রঙের বহির্বাসের প্রান্ত
বারবার লেগে যাচ্ছে ধুলোয়।

চৈত্রের শেষে নির্দয় দুপুরের কথা মনে আছে
বাড়িঘরে লোকজন সবাই নীরব
দূরে ফেরিওয়ালা কি যেন বলছে ডেকে ডেকে,
বাঁশের বেড়ার ভাঁজে গোপন ইশারা খোঁজে
রিফিউজি বিদ্যার্থী বালক।

হিসেব বা লেনদেন কিছু নয়,
সেই অভিমানী উজান দুপুর আমায় ফিরিয়ে
দাও মেগাস্থিনিশ, এখন আমার কোনো
অসুখ নেই, দক্ষিণ শহরতলির স্বপ্নের
ভালো না লাগার করুণ নীরবতা
আমায় ফিরিয়ে দিয়ে যাও;

রাজগৃহ আর হীরাটের মহাবিশ্ব
গভীর আঙুলে মেলে দাও একবার,

নিচে সিঁড়িহীন বাঁধানো পাতকুয়োয় ছায়াময় আদিম জলরাশি
কেউ নেই, সুদূর কলিঙ্গ থেকে উড়ে আসা
সঙ্গীহীন কাক জল খেতে চায়।

মুহম্মদ নূরুল হুদা

কবিতার অনুবাদ ঃ মুক্ততা ও মৌলিকতা

অনুবাদ কি?—মানব অনুভূতির ভাষিক রূপান্তরই প্রাথমিক অনুবাদ। অনুবাদের দ্বিতীয় প্রকারভেদ হচ্ছে স্ব-ভাষিক অনুবাদ, তৃতীয় প্রকারভেদ দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক অনুবাদ এবং শেষোক্ত প্রকারভেদ ভাষা-বহির্ভূতভিন্ন-মাধ্যমে অনুবাদ। গদ্য, পদ্য, প্রবহমান বয়ান, সংলাপ বা অন্য যে কোনো প্রাকরণিক ভাষ্য প্রথমে স্ব-ভাষিক অনুবাদের মাধ্যমে অনুবাদকের উপলব্ধিতে একটি অর্থময়তা সৃষ্টি করে। এই স্তর পার না হলে দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উৎস ভাষার প্রথম টেক্সট বা ভাষ্য থেকে পরবর্তী সহজতর বা স্বচ্ছতর ভাষ্যে বিষয়টিকে উপলব্ধি করার এই পর্যায়টি অতি প্রাথমিক স্তরে মনোগতভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভাষ্যের মূল ভাষাকে উৎস ভাষা (Source Language or SL) এবং অনুবাদ্য ভাষাকে লক্ষ্য ভাষা (Target Language or TL) বলা হয়।

এবারে প্রাথমিক বা অতি প্রাথমিক স্তরে মনোগতভাবেই রূপান্তর হওয়ার একটি উদাহরণ দিচ্ছি বাংলা ভাষা থেকে ঃ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। এটি একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি। এর প্রাথমিক স্ব-ভাষিক অনুবাদ হচ্ছে 'আমার ছেলেমেয়েরা যেন দুধ আর ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে'। স্বভাষিক গভীরতর ও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হচ্ছে 'আমার পরবর্তী প্রজন্ম যেন অভাব অনটনের বাইরে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে।' প্রথমটি শাদামাটা আক্ষরিক অনুবাদ, আর দ্বিতীয়টি বিবিধ অনুষঙ্গ বিবেচনায় রেখে তাৎপর্যময় অনুবাদ। এই দুই স্তরের অনুবাদ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার পরই অনুবাদক ভিন্নভাষিক বা ভাষা-বহির্ভূত ভিন্নমাধ্যমিক অনুবাদে ব্রতী হতে পারেন। তবে কাজটি যত সহজে বলা হলো, আসলে তত সহজ নয়।

২.

তাত্ত্বিকগণ, বিশেষত পিটার নিউমার্ক, অনুবাদের স্তর বা লেভেলকে মূলত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন ঃ টেক্সটুয়াল (আক্ষরিক/শাব্দিক/বাক্যগত), রেফারেনসিয়্যাল (বিবিধ অনুষঙ্গগত), কোহেসিভ (সামঞ্জস্যগত) এবং ন্যাচারাল (প্রকৃতিসম্মত)। প্রথম স্তরে আলোচ্য টেক্সটির প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের অনুবাদ, দ্বিতীয় স্তরে এই টেক্সটির ব্যক্তিক, সামষ্টিক, সাংস্কৃতিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রূপক, প্রতীকী বা তজ্জাতীয় অন্যান্য অনুষঙ্গ, তৃতীয় স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের মধ্যে তুলনা, প্রতি-তুলনা ও সম্পর্কায়ন, এবং সবশেষে

চতুর্থ বা চূড়ান্ত স্তরে লক্ষ্য-ভাষার সকল স্বাভাবিক চাহিদা মিটিয়ে এমন একটি অনূদিত ভাষ্য তৈরি করতে হবে, যাকে কোনো অবস্থাতেই অস্বাভাবিক মনে হবে না। বরং পড়তে গেলেই মনে হবে এটি যেন এই ভাষাতেই (লক্ষ্য-ভাষা) প্রথম রচিত হলো। এই কাজটিই সবচেয়ে সৃষ্টিশীল, শ্রমশীল ও বিপজ্জনক। কেননা অনূদিত টেক্সটকে লক্ষ্য-ভাষার প্রথম টেক্সটের মতো সুপাঠ্য ও মূল-সদৃশ করার এই কাজটি আত্যন্তিক ভাবেই অনুশীলন-সাপেক্ষ। এর ফলে অনেক সময় মূল লেখকের স্টাইল বা শৈলী আর ইনটেনশন বা অভিপ্রায় খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কাটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বেলায়। আবার সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক শাখা হচ্ছে কবিতা, যার অনুবাদ-অক্ষমতা (intranslability) সম্পর্কে রবার্ট ফ্রস্ট সহ অনেক কবিই সোচ্চার। অথচ সব বাদ-প্রতিবাদ সত্বেও আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ফ্রস্টসহ সব কবির কবিতাই ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। আর বর্তমানে অনুবাদবিদ্যা তো একটি ডিসকোর্স বা সৃষ্টি-মাধ্যম হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছে। ফলে কবিতার অনুবাদ হয় না বা সম্ভব নয়, এই যুক্তি এখন তেমন ধোপে টেকে না।

৩.

কবিতার অনুবাদকে গ্রাহ্য করার জন্যে অনুবাদক ও তাত্ত্বিকগণ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁরা সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের কবিতা-কাঠামোর জন্যে বিভিন্ন তত্ত্বীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। একজন গবেষক (লেফেবিয়ার) কাতুলুসের একটি কবিতার নানা ধরনের অনুবাদ বিশ্লেষণ করতে অন্তত সাত ধরনের কাব্যানুবাদ স্ট্র্যাটেজি (অগ্রাধিকার) সনাক্ত করেছেন। এগুলি নিম্নরূপ ঃ ১) ফোনেমিক বা ধ্বনিসম্মত অনুবাদ ২) লিটার‍্যাল বা আক্ষরিক অনুবাদ ৩) মেট্রিক্যাল বা মাত্রাসম্মত অনুবাদ ৪) পোয়েট্রি ইনটু প্রোজ বা গদ্যানুবাদ ৫) রাইম্‌ড বা অন্ত্যমিলসম্মত অনুবাদ ৬) ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর অনুবাদ ৭) ইন্টারপ্রেটেশন বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ।

১, ২, ৩ ও ৫ পদ্ধতিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা খুব সীমিত। মূল ধ্বনি, মাত্রা, আক্ষরিক অর্থ বা অন্ত্যমিল হুবহু অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না এমন নয়, তবে তা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি কাঠামো-শাসিত-আঙ্গিক-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাতে কবিতার বক্তব্য মূলানুগ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মূল কবিতার বাণীগত বা ব্যঞ্জনাগত বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অনুবাদককে মূল কবিতার পঙক্তি-দৈর্ঘ্য, পঙক্তি-সংখ্যা, হুবহু শব্দার্থ, স্তবক-বিন্যাস, যতি-বিন্যাস, উৎপ্রেক্ষা বা রূপক বা অন্যান্য অলঙ্কারের হুবহু প্রতিরূপ নির্মাণ করতে হয়। এই কাজ করতে গিয়ে অনুবাদক অনূদিত ভাষ্যে কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হতে পারেন। কেননা এক্ষেত্রে তিনি আঙ্গিকের কারিগর হয়ে বসেন। মূল কবিতা রচনার মুহূর্তে কবির মনে যে বিমূর্ত অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে রোমান্টিক কবিরা প্রেরণা বলে মানেন, তা অনুবাদে পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাণীপ্রধান, কাঠামোপ্রধান বা বর্ণনাপ্রধান কবিতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সুপ্রযুক্ত মনে হলেও সর্বপ্রকার বিমূর্ত কবিতা, যেখানে অন্তত বিভিন্ন (যথা সাত) প্রকার অ্যামবিগুইটি

বা কূটাভাস কাজ করে থাকে, সেখানে তা ফলপ্রসূ হয় না। বিমূর্ত তাবৎ কবিতায় আছে এক বা একাধিক ভেতর-তল, যে কারণে প্রতিটি নতুন পাঠে একটি সফল কবিতা ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা দেয়। এই ধরনের কবিতা প্রায়-ক্ষেত্রে নতুন ও জীবন্ত মেটাফর বা ইমেজ (চিত্রকল্প) বা নবায়িত শব্দানুষঙ্গ দিয়ে তৈরি হয়। ফলে এ ধরনের প্রতিটি নতুন ও সফল কবিতার একটি স্বতন্ত্র মনোভাষা থাকে। ভাষিক ও কাঠামোগত কসরতে তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। তবে মৃত উৎপ্রেক্ষা বা চিত্রকল্প (ডেড ইমেজ বা মেটাফর) দিয়ে গতানুগতিক কবিতা রচনা করা হলে তার একটি প্রায়-হুবহু প্রতিমা নির্মাণ করা যায়। কেননা এ-ক্ষেত্রে মূল কবিতাটিতে কবি নতুন কিছু নির্মাণ বা সৃষ্টি করেন না, বরং প্রচলিত অলঙ্কার ব্যবহার করে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব কবিতা গদ্যের মতো একার্থবোধক হয়ে থাকে। এই ধরনের কাব্যানুবাদে ভাষাগত, আঙ্গিকগত ও দৃশ্যগত প্রতিমা পুনর্নির্মাণ করা অসম্ভব নয়।

৪.

৪, ৬ ও ৭ পদ্ধতির অনুবাদে অনুবাদক অনেক বেশি স্বাধীনতা নিতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে অনুবাদকের প্রথম কাজ হচ্ছে পুরো কবিতাটি পাঠ করে তার ভেতর-তলের মনোভাষা, ইঙ্গিত, জীবন্ত বা নতুন চিত্রকল্প ইত্যাদি সনাক্তকরণের পাশাপাশি কবিতাটির নানা ব্যঞ্জনা তন্ময় ও মন্ময় পাঠে নিজের উপলব্ধিতে ধারণ করা; তারপর তাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক উচ্চারণে লক্ষ্য-ভাষায় পুনর্সৃষ্টি করা। বিমূর্ত নতুন উপমা-চিত্র-উৎপ্রেক্ষাকে নিজের মনে প্রতিফলিত করে তার আরেকটি বিমূর্ত রূপ লক্ষ্য-ভাষায় নির্মাণ করতে হলে অনুবাদককে এক ধরনের সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা বা মুক্ততার আশ্রয় নিতে হয়। ফলে পঙক্তিবিন্যাস, স্তবকবিন্যাস বা শব্দ-ক্রমেও ভিন্নতা দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। আসলে নতুন চিত্রকল্প ও উৎপ্রেক্ষা একটি নতুন সংস্কৃতির সূচনা করে। অনুবাদে তা পুনর্নির্মাণ করতে হলে লক্ষ্য-ভাষার সার্বিক সাংস্কৃতিক কাঠামো বিবেচনায় নিতে হয়। কখনো কখনো অনুবাদককে মৌলিক কবির মতোই সেই কাঠামো নতুনভাবে প্রতিধ্বনিত করতে হয়। এর ফলে মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হলেও কবিতার আবেদন সুদূরপ্রসারী হয়। আসলে অনুবাদক একরোখা না হয়ে যদি সমঝোতাপ্রবণ হন, অর্থাৎ কাঠামোর যথাসম্ভব সুরক্ষার পাশাপাশি ব্যঞ্জনা ও মনোভাষার প্রতিধ্বনি করতে পারেন, তাহলে যেকোনো কবিতার গ্রহণযোগ্য অনুবাদ করা সম্ভব। এই কাজটি করতে হলে একাধিক বিকল্প খসড়া তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত গদ্যে সাদামাঠা অর্থগত খসড়া, তারপর সাংস্কৃতিক পটভূমির খসড়া, তারপর কবির ব্যক্তিভাষার প্রতিধ্বনির খসড়া। আমি এই ধরনের সমঝোতামূলক পদ্ধতিতে চমৎকৃত একটি অনূদিত কবিতা এখানে উপস্থাপন করছি।

উইলিয়াম ব্লেকের বাঘ

বাঘ রে বাঘ তুই কী উজ্জ্বল
জ্বলিস্ ঘুরে রাত-জঙ্গল;

কোন্ সে হাত বা চোখ অমর
গড়ল রূপ তোর ভয়ঙ্কর?

আকাশ পাতাল কোন্ দূরের
পোড়ায় আগুন তোর চোখের?
শানায় আশা কোন্ ডানায়?
ধরে কোন্ হাত ঘোর শিখায়?

কোন্ সে স্কন্ধ, কোন্ সে কৌশল
বুকে নিঙড়ায় পেশির বল?
যখন বুক তোর ধুকপুকায়,
হাত-পায়ে কি ভয় জাগায়?

কোন্ হাতুড়ি? কোন্ শিকল?
চুলীতে কোন্ মস্তিষ্ক-বল?
কোন্ সে নেহাই? কোন্ সে গ্রাস
আতঙ্কে ঘোর বাড়ায় ত্রাস?

নিম্নে ছুঁড়ে তারার শর
অশ্রু ভাসায় স্বর্গ-ঘর;
হাসলো সে কি কাজ দেখে?
মেষ যে বানায়, বানায় তোকে।

বাঘ রে বাঘ তুই কী উজ্জ্বল
জ্বলিস ঘুরে রাত-জঙ্গল;
কোন্ সে হাত না চোখ অমর
গড়ল রূপ তোর ভয়ঙ্কর?

(মূল ১৭৯৪, বাংলান্তর ৮-১২. ৯. ২০০৭)

বলা বাহুল্য, এই কবিতার অনুবাদে আমি কবিতাটির আঙ্গিকগত, ভাষাগত ও বাণীগত বিন্যাসে মৌলিকতার অনুসারী হলেও উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও চিত্রকল্প নির্মাণে ন্যূনতম মুক্ততার আশ্রয় নিয়েছি। যেমন 'রাত-জঙ্গল' শব্দবন্ধটি 'ইন দ্য ফরেস্ট অব দ্য নাইট'-এর হুবহু অনুবাদ নয়, বরং তার ইঙ্গিত-সম্মত প্রতিধ্বনি। আমরা দেখেছি, উপলব্ধিতে মূল কবিতাকে আত্মস্থ করে অনূদিত তার মনোভাষা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বিস্তর স্বাধীনতা নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, তার বোদলেয়ারের

অনুবাদে। আসলে তিনি বোদলেয়ারের নানা কাব্য-ভাষ্যের মুক্ত প্রতিধ্বনি করেছেন বাংলাভাষায় স্বসৃষ্ট মনো-পঙক্তিকে। তুলনামূলক আলোচনায় এই বিষয়টি আরো খোলাসা হবে। সেই কাজটি অন্য সময়ের জন্যে তোলা রইল।

৫.

আপাতত শেষ করার আগে বলতে চাই, কোনো কবিতা অনুবাদের জন্য তত্ত্ব-পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া যতখানি প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন মুক্তচিত্তে কবিতাটির পাঠোদ্ধার করে একটি নতুন কাব্যপ্রতিমার প্রতিবিম্ব সাজানো। কবির অভিপ্রায়কে অনুধাবন করে তাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে লক্ষ্য-ভাষার কাঠামোতে কিঞ্চিৎ হেরফের করলেও কিছু যায়-আসে না। তবে অভিপ্রায় পুনর্সৃষ্টি করতে হলে অনুবাদককেও তৎমুহূর্তে মূল কবিচিত্তের অধিকারী হতে হবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুবাদক যখন একটি কবিতার পাঠক না হয়ে ওই কবিতার কবিতে সত্তান্তরিত হন, তখনি তাঁর অনূদিত ভাষ্যটি কবিতা হয়ে ওঠে। আসল কথা, অনুবাদক মৌলিকভাবে মুক্ত হতে পারেন না, বরং মুক্তচিত্তে মৌলিক হওয়াই তাঁর জন্যে সুবিবেচনাপ্রসূত। তখনি তাঁর অনূদিত কবিতা নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবে। সেই সৃষ্টিশীলতা তাবৎ তত্ত্বীয় বন্ধন সম্পর্কে অবহিত থেকেও সেই বন্ধন থেকে মুক্ত অবশ্যই।

জাতীয় কবিতা পরিষদের জাতীয় কবিতা উৎসবে ২০১৭-র দ্বিতীয় দিনে (২রা ফেব্রুয়ারি), ঢাকায় বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক নূরুল হুদা এটি পাঠ করেন।

সমকালীন ভারতীয় কবিতা

Contemporary Indian Poems

by

Jayant Parmar
Kumaran
Thanjabhur Kavirayar
P. Ajit Kumar
Yumlemban Ibomcha Singha
Arambam Ongbi Memchoubi
Surjit Patar
Sucheta Mishra
Rabindra K Swain
Suvashree Lenka
Kamal Vora
N. Gopi
Parkash D. Padgaonkar
S. G. Siddaramaiah
Sajal Dey
Kaustavmuni Saikia

All poems are translated in Bengali from english except Urdu Poems by Jayant Parmar.

Translated by

Kakali Gangopadhyay, PrabuddhaSundar Kar,
Krittibas Chakraborty & Rameswar Bhattacharya.

Jayant Parmar
Shantiniketan Soceity,
Radhaswami Road, Ranip,
Ahmedabad-382480
Phone : 91-9427700736.

উর্দু [Urdu]

জয়ন্ত পারমার

মুখবন্ধ
[Foreward]

আমরা দুজনে
নানারঙের স্বপ্নে মশগুল থাকি
যা ঝলমল করে
হাওয়া ভরা ভোরের আকাশে
লাল সুরাপাত্রের মতো,
রাতের কালো ওড়নায় জোনাকির মতো
কুয়াশার চোখে আকাশ-সমুদ্রের মতো

আমার ভেতরে
হৃদয়ের ভেজা মাটিতে
গোপনে পোঁতা আছে
বাক্সবন্দি একটি জিনিস
যা নিজেকে মুক্ত করে, প্রকাশ করে
ভেজা কাগজের ওপর চমকানো তারার মতো
শব্দ আর অর্থ হয়ে
সে-ই আমার কবিতার আমি
সে-ই আমার স্বপ্নের আমি

অনুবাদ ঃ কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

কোথায় রেখেছি কবিতা আমার?
[Where Have I Kept The Poem?]

ডেস্কের ড্রয়ারে
টেবিলের ওপর
আলমারিতে
বইয়ের তাকে
আমার কবিতাকে আমি খুঁজেই চলেছি
আবহমান।
পুরোনো-নতুন বইয়ের
প্রিয় পৃষ্ঠাগুলোর ভেতর
খাদির কূর্তার ছেঁড়া-ফাড়া পকেটে
উটের চামড়ার ব্যাগে
কোথায় রেখেছি কবিতা আমার?

আমি ফের জিজ্ঞেস করি
নেরুদাকে
এ্যামিচাইকে
রিল্‌কেকে—
একটু আগেই তো রেখেছিলাম
কবিতা খুঁজতে খুঁজতে আমি পেয়ে যাই
কলম
দোয়াত
কিছু সাদা কাগজও
কিন্তু আমার হৃদয় থেকেই
বেপাত্তা হয়ে গেল কবিতাটি!

Translator : Krittibas Chakraborty

গালিব
[Ghalib]

যখনই তোমাকে পড়ি
দেখি, প্রতিটি শব্দ
যেন আকাশবিসারী
প্রতিটি স্তবকেই
আমি দেখি
ব্রহ্মাণ্ডের ছায়ার বিস্তার।

অনুবাদ ঃ কৃত্তিবাস চক্রবর্তী

কৈফিয়ৎ
[I Declare]

ওরা যদি লেখে আমার জীবনী
যখন আমি থাকবো না ,
কী পাবে তারা—
শুধু অন্ধকার-শেকলের ঝন্‌ঝনানি,
অপমান-ঘৃণা-থুৎকার আর
ঠোকর খাওয়া দরজায় দরজায়,
পিঠে ওদেরই দেয়া চাবুকের নীল চিহ্ন ছাড়া
আর কী পাবে ওরা?

আমার জন্মদিন, কবে মনে রেখেছিলেন
আমার মা?
কবে আমি চলে যাব, তারই একটি তারিখ
আমি লিখে রেখেছিলাম ডায়েরির পাতায়।
এই দুটি মুহূর্তের মাঝখানে
আমি বেঁচেছি, মরেছি কত কত বার!
যে মাটিতে শেকড় ছিল আমার
ভালোবেসেছি তাকে পাগলের মতো,
কত না স্বপ্নের ফুল ফুটিয়েছি আমি
আমার নিদ্রার গাছে
আর প্রতিবার হাত পেতে শুধু
শুকনো ডালই পেয়েছি।

কোনো সময়ই, আমি চাইনি বুঝতে নিজেকে।
নোংরা নর্দমার কীট ছাড়া কীইবা আমি ছিলাম
যে শুধু পিষ্ট হয়েছে জুতোর নিচে।
এই সব কথাই শত বছর প্রাচীন
আমার যন্ত্রণারা
কীভাবে বন্দী হবে কোনো কবিতায়?

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

তামিল [Tamil]

কুমারন
গালি
[Slang]

ব্যবহৃত হতে হতে
গালিগালাজ এখন মামুলি ব্যাপার।

অভিধানের পৃষ্ঠায় ভালো শব্দগুলো
রীতিমতো পরিত্যক্ত, জড়।

গালিগালাজের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে এ শহর।

রামধনুর বিভিন্ন রঙে লেখা গালি
শহরের দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে আছে।

ভালো ভালো অনেক শব্দের ছদ্মবেশে
অজস্র গালিগালাজ
নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে।

একবার যদি গালি কোথাও ছাপার অক্ষরে বেরোয়
বাজারে তাদের দাম বেশ চড়ে যায়।

কুকুরেরা যখনই পরস্পরের প্রতি
ঘেউ ঘেউ করে, আমরা এর ব্যাখ্যা দিই
কুকুরেরা একে অপরকে গালাগাল দিচ্ছে।

যেদিকে তাকাই
বুকভর্তি গালি নিয়ে মানুষেরা
সঠিক খুঁজে বেড়াচ্ছে সঠিক ব্যবহারের সুযোগ।

অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।

Thanjavur Kavirayar
R. Gopalakrishnan
39 Ram Nagar extn. Urappakkam-603211.
Dist. : Kanchipuram, Tamilnadu.
Call : 044-22750831 / 91-9677210062

থানজাভুর কবিরায়ার
স্পর্শ করলাম আর নিস্তেজ হয়ে গেলাম
[Touched and Wilted]

পুরোনো ট্রাঙ্কের জমানো জিনিস
ঘাঁটতে ঘাঁটতে
হঠাৎ হাতে ঠেকল ছোট্ট একটা পুঁটলি

ভেতরে রাবার-নলের মতো কিছু একটা
শুকনো এবং পাকানো
অকারণেই মুচড়ে উঠল আমার পেট

জিজ্ঞেস করলাম বাবাকে,
হেসে উত্তর দিলেন তিনি—
'ওঃ, তোমার জন্মের মুহূর্তে
যে ধাই ছিলেন, তিনিই দিয়েছিলেন
তোমার এই নাভি-রজ্জু

কত সহজে উচ্চারণ করলেন তিনি
এমন বজ্রের মতো কথাগুলো;
এ তো আমার মায়ের এক ছোট্ট অবশেষ
যে মা আজ আর নেই।

জলভরা চোখে সেটা হাতে নিলাম
চেয়ে দেখলাম, স্পর্শ করলাম
আর নিস্তেজ হয়ে পড়লাম।
আলতো চাপড় মেরে

সবার শোনার আড়ালে আমি
ডাকলাম— মা!

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্স ও দুটো ফড়িং
[An Empty Matchbox and Two Dragonflies]

ছোট্টবেলা
সারাদিন খুঁজে খুঁজে
আমি পেয়েছিলাম সেই সম্পদ—
একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্স
আর দুটো ফড়িং।
তারপর থেকে ঘাম ঝরিয়ে খুঁজেই চলেছি
বছরের পর বছর,
তবু আজও আমি
এর চেয়ে বড়ো সম্পদ আর পাইনি।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

বাবার ছাতা
[Appa's Umbrella]

যেখানেই তিনি যেতেন
কখনো হারাননি তাঁর ছাতা—
আমার বাবা।
এই ছাতা কী নিষ্ঠুর,
এখনো দাঁড়িয়ে আছে
আমার বাবাকে হারিয়ে।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

মালয়ালম [Malayama]

পি অজিত কুমার
ডিভোর্সের আগের দিন
[The Day Before Divorce]

রান্নাঘরে আমরা জ্বলন্ত দুটি স্টোভ
একটিতে প্রেসার কুকার অন্যটিতে ফ্রাইং প্যান
রান্নাঘরে শব্দের ছুরিরা পোড়াচ্ছে ঝাল লংকা
অতীতের কাহিনিগুলোর পেঁয়াজ কুচোতে কুচোতে যখন
বিছানায় আমরা আলাদা দুটি বালিশ ছাড়া আর কিছু নই।
একদিকে বাড়ির ভেতরে বাগানে উঁকি দিচ্ছে একটি গোলাপ
অন্যদিকে রাস্তায় কারোর জন্যে উঁকি দিচ্ছে একটি জবাফুল।
বাড়ির গেটের দুটি আলাদা আলাদা পাল্লা
আমরা তখনই একসঙ্গে হই
যখন কারোর জন্যে গেট বন্ধ হয়।
ছাদের কাপড় টাঙানোর তারে
দুটো হৃদয়ের মাঝখানে প্রসারিত হচ্ছে এক
ঝুলে-থাকা ময়লা ন্যাকড়া।

অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।

Yumlembam Ibomcha Singha

মণিপুরী [Manipuri]

য়ুমলেম্বম ইবম্চা সিংহ

কেঁচো ও আমি

[Earthworm and Me]

অনেক মানুষকেই আমি খুন করতে চাই
দাঁত ভেঙে দিতে চাই অনেকেরই
আঘাত করতে চাই চোখে
কষে লাথি মারতে চাই পেটে

কেন আমি এত বাজে হয়ে উঠেছি, জানি না
আগে আমি ভালোই ছিলাম
কেঁচো দেখলেই আমি লজ্জা পাই
কত ভদ্র আর অমায়িক এই কেঁচো
কী অনায়াসেই না ব্যাঙ তাকে গিলে খায়
একটি শব্দও সে করে না
পিঁপড়েরা দাঁতে করে তাকে টেনে নিয়ে যায়
আর কেঁচো শুধু আন্দোলিত হতে থাকে

পিঁপড়েকে কেঁচো কখনো কামড়ায় না
শান্ত আর পরিচ্ছন্ন থাকে
কেঁচো কাউকেই ভয় দেখায় না, আঘাত করে না
চুপ করে থাকে, কথাও বলে না
চিৎকার করে না, কোনো অভিযোগও নেই
কেঁচো অহিংসার প্রতীক,
শান্তির প্রতিমূর্তি
কেঁচো দেখলেই আমি কেন লজ্জিত হব না
কী অসাধারণ অন্যরকমই না এই কেঁচো!

■ **অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।**

Arambam Ongbi Memchoubi
Sagolband Meino Leirak,
Imphal-795001, Manipur.
Call : 0385-2230061

আরামবাম ওংবী মেমচৌবি

আমাকে নির্লিপ্ত থাকতে দাও

[Let me remain aloof]

পাছে আমার স্বর না নষ্ট হয়ে যায়
মানুষের ভাষা তাই আমাকে শিখিও না।
তোমার সোনালি পোশাক আমাকে পরিয়ো না
আমার নিজস্ব রং সংক্রমিত হতে দাও।
দয়া করে টেনে নিয়ো না তোমার কাছে
আমার শরীর রঙিন হতে দাও।
বামনের মতো আমাকে নির্লিপ্ত থাকতে দাও।

অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।

একটি কোমল সবুজ পাতা

[A green tender leaf]

কোনো একসময় আমার ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়াল
তোমার প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ
গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করল চিরকালের মতো।
আজ সেই ভয়ানক রাত
আমি জানি আমি অনুভব করতে পারছি
এ রাত তোমার আমার বিচ্ছেদের রাত।

এই দীর্ঘ বছর আমরা দুজন
শুধু লড়ে গেছি দ্বৈত যুদ্ধ
কিন্তু আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি একসাথে
আমাদের যাত্রার শেষ প্রান্তে।
তোমার শেষ চুম্বন, তোমার শেষ আলিঙ্গন
ওঃ! কী তিক্ততা তাতে
কিন্তু এই যন্ত্রণা তোমার বদলে জায়গা নেবে
আমার হৃদয়ে, চিরদিনের মতো।
যখন ফুরিয়ে যাবে এই রাত
যখন ঘুম ভাঙবে সকালের
প্রতিদিনের মতোই আবারো একইভাবে
পড়বে এসে নতুন সূর্যের প্রথম কিরণ
আমি আমার চারপাশে দেখব
তোমার প্রাচীন ইতিহাসের গুঁড়িয়ে যাওয়া
আর সেই ধ্বংসগর্জন থেকে
ছিটকে উঠবে একটি ছোট্ট শাখা
তাতে একটি সবুজ কোমল পাতা।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

Translator : Kakali Gangopadhyay

Surjit Patar

পাঞ্জাবি [Punjabi]

সুরজিৎ পাটার
আমার মা ও আমার কবিতা
[My Mother and My Poems]

মা আমার কবিতা বুঝতেন না
যদিও তা আমার মাতৃভাষায় লেখা।

মা এটুকু বুঝতেন
আমার ছেলের ভেতর মনখারাপ জমে আছে।

কিন্তু আমি যেখানে রয়েছি
তার মনখারাপ কী করে হয়?

নিরক্ষর আমার মা
খুব যত্ন নিয়ে আমার কবিতা পড়ে
নিজেকেই বলতেন ঃ
দ্যাখো, আমাদের গর্ভ থেকে আমরা যে ছেলেদের জন্ম দিই
তারা তাদের মনখারাপ আমাদের না বলে
কাগজের কাছে বলে।

কবিতা-লেখা কাগজটিকে
এই আশায় মা বুকে চেপে ধরতেন
এভাবেই হয়তো ছেলের খুব কাছে আসা যায়।

অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।

পঞ্চনদীর দেশ
[The Land of Five Rivers]

শোক
হিংসা
ভয়
হতাশা
অন্যায়।
আজকাল এই আমার পাঁচটি নদীর নাম।

একদিন তাদের নাম ছিল
সাতলেজ
বিজ
রবি
ঝিলম
চেনাব।
আমার বিশ্বাস, এমন একটি দিন আসবে যেদিন
আমার পাঁচটি নদীর নাম হবে
সংগীত
কবিতা
ভালোবাসা
সৌন্দর্য
ন্যায়।

অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।

Sucheta Mishra
Puri, Orissa.
Call : 09937159891.

ওড়িয়া [Oriya]

সুচেতা মিশ্র
নারীশক্তি
[Women Empowerment]

সে একসময় ছিল
যখন বাজারে যেতে পারত না সে

এখন সে গোটা বাজার তোমার
ড্রইংরুমে তুলে আনতে পারে।

তোমার শরীর থেকে সে এখন শুষে নিতে পারে ক্লান্তি
নিজেকে সে তৈরি করে নিতে পারে তোমার চাহিদা অনুযায়ী।

তার সৌন্দর্যের চেয়েও আকর্ষণীয় তার হাসি, আর
হাসির চেয়েও লোভনীয় তার শরীরী গড়ন

যদি তুমি হেয়ার অয়েল কিনতে চাও
জলপ্রপাতের মতো তার চুল দেখে নিতে পারছ
সাবান কেনার আগে তুমি সহজেই দেখে নিতে পারছ
তার নগ্নতার শরীরী ঝলক

তোমার শেভিং ক্রিম থেকে জাঙিয়া, সবকিছুই
বিক্রি করতে সে প্রস্তুত।

খিদে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মোহিনী পোশাকে সেজে
সে এখন তোমাকে এগিয়ে দিতে পারে নানা রঙের খাবার

তার ফাটা গোড়ালির জন্যে লোশন আনতে সে পৃথিবীর
যে-কোনো প্রান্তেই চলে যেতে পারে
কিন্তু তার চিড়-ধরা নিয়তিকে সারানোর
কথা ভেবে ভেবে সেও দিশেহারা।

দেখে মনে হতে পারে তার আদৌ কোনো দুঃখ নেই
হাসিমুখে সে তোমাকে চা এগিয়ে দেবে
প্রাণখোলা হাসি হেসে কেচে দেবে
তোমার ময়লা জামা
ব্যথা কমানোর জন্যে তোমার কোমরে মলম লাগিয়ে দেবে

আধুনিক খাবার, পানীয়, গাড়ি, ক্রিম, লোশন,
নতুন ডিজাইনের কাপড়
সবকিছুই সে বিক্রি করতে পারে আজকাল।
অসহায়তার চূড়ান্ত মুহূর্তে সে ঙেতামাকে
বিক্রি করে দিয়েছে শরীর ও কামনা
এমনকি বিক্রি করে দিয়েছে নিজের শিশুটিকে
যার জন্যে আদৌ তাকে হতে হয়নি
কোনো বিজ্ঞাপনের মডেল।

অনুবাদ ঃ প্রবুদ্ধসুন্দর কর।

Translator : Prabuddhasundar Kar

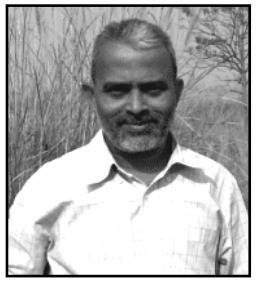

Rabindra K Swain
Bhubaneswar, Orissa
Call : 91-9437303387

রবীন্দ্র কে সোয়াইন

আঁধারের বসন্ত
[Grace of Darkness]

আঁধারের ভেতর তুমি হেঁটে যাও
খালি পায়ে, পেছনে পড়ে থাকে আলো
আর জুতো, এতদিন বিশ্বাস করেছিলে।

তোমাকে ছাড়া এদের কেমন হাস্যকর লাগছে
তোমার শপথ তোমারই সামনে পড়ে থাকে
যেভাবে মাড়িয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে সব বুনো ঘাস

পথে পথে, যা কিছু মাড়ালে তুমি
পায়ের নিচে, পড়ে থাকে নিচে।

যা কিছু আছে তোমার পায়ের অধীন
ভাবোনি কখনো, দায় আছে মাটির কাছে
তেড়েফুড়ে ওঠেনি কখনো, তোমার

যাবতীয় আত্মত্যাগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে
কাকে তুমি ছাড়লে?
কাকে তুমি টেনে নিলে বুকের আলিঙ্গনে

শুধুই আঁধারে তুমি খুঁজে বেড়াও
আলো, যেভাবে খোঁজে শিশু গর্ভাশয়ে
জন্মের আগে।

অনুবাদ ঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

পুকুর
[Pool]

পুকুরটি ভরে আছে
সব ভাবনার মাছে

চাঁদের আলো সেখানে
স্পর্শ করেনি গভীর

যারা একদিন এইখানে
পবিত্র স্নান করেছিল,

বা পায়ের গোড়ালি সাফ
করেছিল সিঁড়িতে পা ঘষে

তারা এখন বেঁচে আছে জাদু কাহিনিতে

পথের গানে বধির এই
পুকুরের নিজস্ব কোনো গীতি নেই

দুঃখ আছে, একান্ত ব্যক্তিগত
দুঃখ হলো এই—

কোনো মাছই এখনো ছুঁয়ে দেখেনি
বিবর্ণ পাতার মেঝে।

অনুবাদ ঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য

Translator : Rameswar Bhattacharya

Dr. Subhashree Lenka
Geeta Bhaban, Poduhan Pada
New Coloney
Balasore-756001. Odisha.
Call : 91-9437798920

শুভশ্রী লেঙ্কা
আজ আকাশে কোনো চাঁদ নেই
[There is no moon in the sky tonight]

খবর এল ওপর থেকে
রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে
সবই দেখছে সে
যাকিছুই এখানে করছে তারা
গোপন নেই তার কাছে
হতে পারে, সঠিক সময়ে, লুকোনো নকশাল-ঘাঁটিতে
হয়ে যাবে সে পুলিশের গুপ্তচর, অতএব অপহরণ করো তাকে
রাত শেষ হওয়ার আগেই।

লরির দীর্ঘ সারির যেন শেষ নেই
আর সারিবদ্ধ লম্বা আলোর রেখা সারারাত
যেন খনিগর্ভে চলেছে অভিযান
এখানে ওখানে বক্সাইট আর ম্যাঙ্গানিজের খোঁজে
জঙ্গল কেটে পরিষ্কার চলছে অবিরাম স্বয়ংচালিত যন্ত্রে
ভরে উঠছে চারদিক শব্দে, ধুলোয়, ধোঁয়া আর দূষণে
শ্বাস নিতে পারছে না সে।
বিশুদ্ধ বাতাস নেই এক ফোঁটা,
নেই অন্তত কয়েক ঘন্টার নিরিবিলি ঘুম
শ্বাসকষ্টে কাশির গমক

হয়তো সে নিতে গেছে
বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা বিধান

অথবা, কে জানে, হালফ্যাশানের রীতি মেনে
সে গেছে বুঝি কোনো বিউটি পার্লার
পরিপূর্ণ করে নিতে বন্য সৌন্দর্য
চমক আনতে আরো নতুন চেহারায় তার
হয়তো মুছে ফেলতে চাইছে
নিটোল মুখের ওই দাগগুলো
ভুরুতে সৌন্দর্যের কোনো ঝলক চাইছে আনতে
অথবা আঁকবে সে কপালে কোনো মোহনীয় ট্যাটু।

কেউ একজন বলছিল সেদিন
নক্ষত্ররা একজোট হয়ে এসেছিল
গণতান্ত্রিক বিচার চায় তারা।
শুধু একজনই কেন পাবে মূল অধিকার
এত বেশি আলো ছড়ানোর, অন্যরা বঞ্চিত কেন?
অতএব দায়িত্ব থেকে দেওয়া হোক অব্যাহতি তাকে
অথবা বদলি করো অন্য কোথাও।

এবং সমস্তদিন
টেলিভিশনের একটি সংবাদ চ্যানেলে
শিরোনামে উঠে এল এক মৃত্যুর কথা
জঙ্গলের অখ্যাত মাওবাদী এক
পুলিশী সংঘাতে যে মৃত, যখন
সমস্ত পুলিশ ও প্রশাসকগণ ব্যস্ত রইলেন
পরিচয় খুঁজে নিতে সেই একটি মৃত মানুষের।

আজকের রাত কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া
বাতাসও অপরিচিত একটু।
নতুন চাঁদের অন্ধকার রাত নয় এটা,
তবুও জানে না কেউ কেন
চোখে আজ ঘুম নেই কারোর
আর আজ এই রাতে আকাশে নেই কোনো চাঁদ।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

Kamal Vora
A-403, Parasnath, Sudha Park
Shanti Path, Ghatkopar (E)
Mumbai-400 077
Call : 91-9819820286

গুজরাটি [Gujrati]

কমল ভোরা

এক খণ্ড কাগজ
[Sheet of Paper]

১.
কোনো কিছুই নয় বেশি সূক্ষ্ম
স্বচ্ছ
পবিত্র
সত্য
সুন্দর
এক খণ্ড সাদা কাগজের চেয়ে

২.
ও আমার প্রিয়তম...
এই আমি ভাঁজ করলাম এক খণ্ড সাদা কাগজ
ভরে দিলাম একটি খালি খামে
কারণ কথার ভিড়ে ছিটকে যায় যা বলার ছিল
শব্দরা ঝড় তোলে আমাদের মাঝখানে
অর্থ ভিন্ন হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন যতিচিহ্নে
আমার প্রিয়তম, তাই এসো
এই শূন্যতার পথে
এসো আমরা পরস্পর কথা বলি
নীরব উচ্চারণে

৩.
সময়, সেই লয়কারী
মুছে দেয় জ্ঞান, মুছে দেয় অজ্ঞান
উচ্চাশা, শ্রদ্ধা, শব্দের সব রূপ
বিলীন করে দেয় হাড়-মাংস-মজ্জা
মুছে দেয় আকাঙ্ক্ষা, রাগ, লোভ, মোহ
অহংকার ও শত্রুতা
বিলীন করে দেয় পাথর, ইঁট, ইমারত
নিশ্চিহ্ন করে দেয় বসতি
শহর ও তার প্রথম বাসিন্দা
শস্যকণা থেকে ধূলিকণা
পাহাড় থেকে উপত্যকা
সবকিছু মুছে দেয়
সময়ের অগ্রগতি অতি ধীরে বিলীন করে দেয় সব।
এই বয়ে চলা অলৌকিক সময়ে
আমি রেখে দিই সেই এক খণ্ড সাদা কাগজ

৪.
শব্দেরা
কোলাহলপ্রিয় আর বন্য
বেড়ে ওঠে কাগজের ওপর
নিয়ন্ত্রণহীন আগাছা জঙ্গল যেমন
বর্ষার দিনে
আমি
নিষ্ঠুরভাবে উপড়ে ফেলি তাদের
আশায় আশায় খুঁজি, হায়, এক ইঞ্চিও যদি পাই
সাদা জায়গা!

৫.
ঠিক যেমন
স্বচ্ছ, স্থির জলের দিঘিতে
আকাশের অনায়াস গমন ভেতরে বাইরে
কুয়াশা যেভাবে অবিশ্রাম ঝরে পড়ে

গ্রাস করে ফেলতে চায় সমস্ত বিশ্বকে
মরুভূমির বালুকণা যেভাবে
ঘূর্ণিঝড়ে লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ
সমুদ্র ঢেউ যেভাবে জোয়ার-ভাঁটায়
উত্তাল করে রাখে সমুদ্রকে
সেরকমই
ঠিক সেরকমই কতকিছুই ঘটে
সাদা কাগজের বুকে।

৬.
সাদা কাগজ মুছে দেয়
সবকিছুই— যা-ই আমি লিখি
কলম ও কালির সব প্রস্তুতি সত্বেও
কাগজ তার গভীরে টেনে নেয়
প্রতিটি অক্ষর
আর তারপরেই পিছন ফিরে থাকে
উদাসীনভাবে
শুধুমাত্র
কয়েকটি মুহূর্ত আমি কাটাই এক
অনির্বচনীয় আনন্দে
বাঁকাচোরা শব্দের
সাজানো বহরের আমেজ মেখে

৭.
কোনো কোনো সময়
নিজের সাথে মজা করে
আমি খুঁজি সত্যের মধ্যে উপস্থিতি
অথবা উপস্থিতির মধ্যে সত্যতা
আমি ঢুকে পড়ি কাগজের ভেতর
অক্ষর হয়ে
এবং খেলতে থাকি সুন্দরী রেখাদের সাথে।

৮.
সাদা কাগজের শুভ্র তুষারঝড়
রোখা যায় না কালির বড়াই
কিংবা মৃগী রোগীর মতো দুর্বল আঙুলে
আবার কাগজকে তার নিজের
শুদ্ধতায় যথাযথ রেখে দেওয়াটাও
সত্যিই অসম্ভব!

৯.
যদি আমি লিখি
সেটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে
যেমন কোনো প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায় ক্রমে
যদি আমি না লিখি
হালকা বাতাসে সব উধাও
কুয়াশার মতো
তাই ভালো এই যে
চোখের সামনে যাকিছু আছে তার মধ্যে
পিষ্ট হয়ে থাকা এই কাগজ আমি তুলে নিই
এবং আস্থা রাখি তার শুভ্র অস্তিত্বে।

১০.
যে মুহূর্তটিতে
আমি পূর্ণ মগ্ন থাকি
কাগজকে শব্দের আকর্ষণ থেকে অনেক
অনেক উপরে ধরে রাখতে
তখন কী গোপন থাকে ওই
জমাট হিম শুভ্রতার নিচে

১১.
জোর করে যতই আমি লিখতে যাই
বারবার এবং আরো একবার
আমি পাই না কণ্ঠের স্পষ্ট উচ্চারণ
মেলে না শব্দের সুললিত গঠন

সবকিছু ঘূর্ণিস্রোতে ছুঁড়ে দিয়ে
আমি কাগজকে রেখে দিই
আরো আরো সাদা।

১২.
তুলে নাও
ওই শব্দের ভাঁড়ার
আর অলঙ্কারের দম্ভ
খুলে ফেলো
বিশেষ্য, বিশেষণের পোশাক
আর সর্বনামের মুখোশ
বন্ধ করো ক্রিয়ার চলন
পদ্যরচনার প্রচেষ্টা আর সাহস
সাহস সেই মুখ্য চালকের মুখোমুখি দাঁড়াবার
যখন জানিই না, তা
সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় বা অন্যকিছু।

১৩.
সত্যিই কঠিন
একটিও অক্ষর হিজিবিজি কাটা
একটি লিখিত শব্দ মুছে ফেলাও
কঠিন....অসম্ভব কঠিন।
হে জ্যোতির্ময় শুভ্রতা...!
তুমি স্পন্দমান হও, বয়ে চলো
বয়ে চলো
দূর করে দাও সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব
নশ্বর আর অবিনশ্বরের মধ্যে।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

Dr. N. Gopi
House No. 13-1/5B,
Srinivaspuram, Ramanthapur,
Hyderabad-500013.
Call : 91-9391028496 / 040-27037585

তেলুগু [Telugu]

এন গোপী

আমাদের গ্রাম— এক মহাকাব্য
[Our Village-Epic]

. আমার কবিতা নিশ্চিত বড়ো নয়
আমার মানুষের চেয়ে।
আমার পংক্তিমালা পদতুল্যও নয় তাঁদের।
আসলে, তাঁদের মুখজ্যোতি
পূর্ণতা পায় না আমার কবিতার অভিব্যক্তিতে।
তাঁদের দুঃখকষ্ট, মর্মপীড়া
ও বেদনাশ্রুর কাছে, তাঁদের সংগ্রামের ক্ষমতার কাছে
আমার কবিতা ম্লান।

আমাদের গ্রামের আকাশ, পাহাড়
ধূলিধূসর হাওয়া, সর্বত্রই—
কেউ, কোনোসময় লিখে গেছে এক মহাকাব্য
যা অনন্ত, চিরদিনের।
আশ্চর্য এই যে, আজ কিংবা গতকাল
প্রবহমান পাঠে বদলে যায় মানে।
ঠিক সেভাবে, আমাদের গ্রাম যেন নিশ্চিত মহাকাব্য এক

লেখা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, সতেজ সবসময়।
আমার চেতনা আমার গ্রামের চেয়ে মহান নয়
হতে পারে তা একতরফা।
এমন নয় যে বিচ্ছেদ ঘটেনি আমার অতুলনীয় ভালোবাসা থেকে
প্রাণের বন্ধুদের ছবি আমার হৃদয়-প্রাচীরে আঁকা নেই
এমনটাও নয়।
কিছু একাত্মতা, কিছু প্রতিবিম্ব
অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা
ক্ষুধার সারির মলিন প্রতিকৃতি
তবুও একটু হাসিমুখ
ভালোবাসার সেই মানুষটির একটি সান্ত্বনা-বাক্য
যদি তুলনা করি
আমার কবিতা কখনোই এত চিত্তগ্রাহী নয়

সবুজ সংগীতের মতো এই বৃক্ষরাজি
উজ্জ্বল করেছে আমার অনুভূতি
সূর্যোদয়ের রং রঙিন করেছে আমার চিন্তা
আমার কবিতার যত্নে স্পর্শ রয়েছে
প্রতিটি পাখির ডানার
সেই সংগীতকে আমার অভিবাদন
যে জাগিয়ে তুলেছে আমার অন্তরকে
সেই বৃষ্টিকে আমার ধন্যবাদ
যে সিক্ত করেছে আমার হৃদয়কে।
এভাবেই হয়তো আমি এগিয়ে যেতে পারি
কিন্তু আমার কবিতা কখনোই পারে না
আমার গ্রামের অভিজ্ঞতার চেয়েও মহান হতে।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

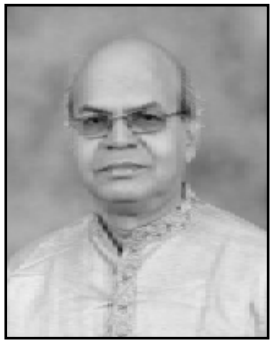

Prakash D. Padgaonkar
'MATRU-KAILASH
M-16, Housing Board Colony
Alto Porvorim, BARDEZ, GOA-403521
Call : 91-9423060384

কোঙ্কনী [Konkani]

প্রকাশ ডি পদ্‌গাঁওকার

আমি একটি পাখি

[I am a bird]

আমি একটি পাখি
ভবিষ্যতের নীড়ে
সময়ের ওপর বসে আমি তা দিয়ে চলেছি
আমিই তার একমাত্র সাক্ষী।

আমাকে বোঝে না কেউ
আমাকে খোঁজে না কেউ
আর তাই,
অবচেতনে আমি গুনে চলেছি
পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ
কোনো কিছুই আমাকে প্রভাবিত করে না
যদিও আমি নিজে
এই সমস্ত ঘটনারই এক ভগ্নাংশ

আমি একটা পাখি।
সেই স্মরণেরও অতীতকাল থেকে
আমি ডানা মেলে উড়ে চলেছি

সময়-গ্রহ-মহাবিশ্বের রত্নখচিত প্রান্ত ঘিরে
এই শব্দদীর্ণ যান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে
যদিও ধ্বংসযজ্ঞে উন্মুখ সব অস্ত্র।

একটি পাখি আমি ক্ষয় ও মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে।

চারাগাছটি

[The seedling]

ও কোমল চারাগাছ
কেমন অনায়াস বেড়ে উঠছ মেদিনীর গর্ভ থেকে
নরম কচি দেহ,
দূরে ঠেলে আদিম অন্ধকার
উদ্ভাসিত সু-উজ্জ্বল আলোর চেতনায়
তোমাকে আমার অভিবাদন।

বেদ ও গীতার আবহমান বার্তার উত্তরাধিকার
তোমার এই বেড়ে ওঠায়
ছড়িয়ে দিচ্ছে বিবর্তনের দীপ্ত স্বপ্নের কথা
তোমার প্রতিটি শাখা ও প্রশাখা
এমনিভাবেই শুষে নিচ্ছ তোমার ভেতর
পার্থিব সময়স্রোতের সব দুঃখ-অস্তিত্ব।

ও পল্লবিত চারাগাছ
তোমার মধ্যে গড়ে তুলছ
আগামী শতাব্দীর ভিত,
আমার গভীর অভিবাদন তোমায়!
একদিন ফুলে ফুলে ভরে উঠবেই তুমি
চিরন্তন সত্যের এটাই দৃঢ় শপথ।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

Prof. S. G. Siddaramaiah
No. 6 Aseema
JayaRama Layout
Near Corporation Bank, Jakkuru
Bengaluru-560064
Call : +91 9448949737

কন্নড় [Kannada]

এস জি সিদ্ধারামাইয়া

মা
[Mother]

ঘরের ভেতর, মা খাবার বানাচ্ছেন তাঁর ছেলের জন্য
রাস্তায়, দিনের প্রথম কোলাহল
'ভবতিভিক্ষাংদেহি'
যেন জেগে উঠল অতীতের একটি স্বর
নিমেষে তাঁর সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে সজাগ হল শ্রবণ
একটি মুহূর্ত, আবার সেই প্রতিধ্বনি
'ভবতিভিক্ষাংদেহি'
প্রবল উৎকণ্ঠায়, ছুটে গেলেন তিনি দরজায়
হাতে তাঁর খাদ্যপূর্ণ পাত্র
তৃতীয় এবং শেষ ডাক—
'ভবতিভিক্ষাংদেহি'
স্মৃতির সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিরূপ
মিশে গেল যে আদলে
পরনে চীরবাস
ভিক্ষাপাত্র হাতে
ক্ষীণ শরীরে উজ্জ্বল দুটি চোখ

তিনি দেখলেন
সেই সন্ন্যাসীর নীরবতাই হয়ে উঠছে কথা
'মা'— খাওয়ার অপেক্ষায় ডাক দিল ছেলে

অতীতকে কাছে টানা সেই বেদনার সেতু পার হয়ে
যেন প্রান্তে পৌঁছোলেন তিনি
ধরা গলায় কিছু শব্দ, যা কোনো কথারও চেয়ে বেশি
হাতে ধরা খাবারের পাত্রে ঝরে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রু
পায়সান্নটুকু তখনো তাঁর হাতে
'আর কত দেরি?'—ডাকছে ছেলে ভেতর থেকে
বিশ্বের আলো যেন পাত্র বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে তাঁর
অন্তরে বইছে প্রশ্নের স্রোত
বিরোধ বাধাচ্ছে মাতৃত্বের সঙ্গে
'এই তো আমি আসছি বাবা'— তিনি ছুটে গেলেন ঘরের ভেতর
কিন্তু যেতে যেতে
হাতের খাদ্যটুকু ঢেলে দিয়ে গেলেন
ভিক্ষাপাত্রে।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

সত্য
[Truth]

গাছ থেকে পাতাটিকে খসে পড়তে দেখেই
খুশি হল হাওয়া
এবং অবশ্যই কিছুটা ভীতও
আলতো করে হাতে তুলে নিয়ে
ধীরে রেখে দিল পৃথিবীর দোলনায়
পাতাটির এই দোলনা-সুখ
সত্য নয় সবসময়
কখনো কখনো হঠাৎ রাগে
আরো আরো ধুলোর সঙ্গে
বাতাস তাকে উড়িয়ে দেয় আকাশের দিকে
ঘূর্ণি হাওয়ায় পাক দিতে দিতে
তুলে নিয়ে যায় উপরে

কিছু বোঝার আগেই
বহুদূর পার করে
সমুদ্র-জলে ছুঁড়ে দিয়ে
শান্ত হয়।
পাতা তখন মাটি থেকে জলে
কখনো ডোবে কখনো ভাসে
পালকের মতো এই নাচ কখনো
ঢেউটার মাথায় কখনো নিচে
যদি একেই বলি ভাগ্য
তবে সে অনুভূতির সৃষ্টি
আমাদের মনের গহীনে
একেই যদি বলি চরম দুর্দশা
তবে সে পরিমাপ শুধু আমাদের চোখের
সব সত্য ধরা দেয় না সবার কাছে
সত্য আপেক্ষিক
সত্যের এই আপেক্ষিকতা
আমাদের প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।
যখন আমরা কাঁদি, প্রকৃতি কাঁদে
যখন আমরা হাসি, প্রকৃতি হাসে
কিভাবে সৃষ্টি হয় এই বিস্ময়?

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

Dr. Sajal Dey
North-Eastern Hill University. Meghalaya, Shillong.
Call : 91-9434662169/91-9436374878

HAIKU

সজল দে
শান্তিনিকেতন থেকে হাইকু
[Haikus from Santiniketan]

১.
বেড়ে ওঠো।
মূল্য দাও।
বাবার কাছে যাও।
তাঁকে গল্পটা বলো।

২.
তথ্য।
আরো আরো তথ্য।
একটা শ্রেণীকক্ষ জুড়ে
ছড়ানো রামধনুর টুকরো।

৩.
মাঝরাত।
ঝিম ধরা পথের আলো।
একটি নির্জন ক্যাব।
মনে পড়ে তোমার জন্মদিন?

৪.
সোনাঝুরি গাছেরা।
সোনাঝুরি গাছেরা।
ওরা পাহারাদার
মৃতপ্রায় খোয়াইয়ের।

৫.
পাইনবন, পাইনবন
সোনালি মেয়েরা।
দেহবিভঙ্গ
পর্বত হিমালয়।

৬.
লাল কাঁকড়ারা।
সূর্য আর বালি আর কোনো ফেনাপুঞ্জ নেই।
সাগর
ডুব দাও।

৭.
বল্লভপুর ডাঙায় একটি শরতের চিহ্ন।
গাছেদের ছায়াহীন ছায়া।
মাঝরাত।
কোজাগরী।

৮.
তুমি বললে, 'ভালোবাসা'।
নদী নীরব ছিল
যেমন থাকে।
ঢেউয়েরা ফেটে পড়ল সশব্দ হাসিতে।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

.....
অনেক পাঠকের কাছে এটা মনে হতেই পারে যে ছোটো মাপের এই কবিতাগুলো ধ্রুপদী হাইকুর সমস্ত শর্ত পূরণ করে না। তাঁরা এই কবিতাগুলোকে 'অনুকবিতা'ও বলতে পারেন। কবির বিশ্বাস যে প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞার সাথে সমঝোতা করা যেতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সাথে নয়। আমরা যেহেতু এখন আর প্রাচীন ধ্রুপদী যুগে বাস করছি না, তাই বর্তমান সাহিত্যরীতি অনুযায়ী তথাকথিত অনেক সংজ্ঞাই বদলে নেওয়া প্রয়োজন। —**সজল দে।**

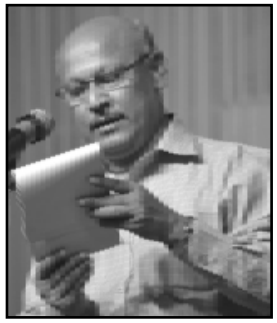

Sri Kaustubh Moni Saikia
Kamarbandha Ali
Dist. Golaghat, Assam
Call : 0361-2130057

কৌস্তভমণি সইকিয়া

পাহাড়ের কান্না

[Tears of the mountain]

গাছে আর ঝোপেঝাড়ে হাজার চোখ মেলে
স্থির চেয়ে আছে পাহাড়টা
তার গল্পের লাঠিতে ভর করে জবুথবু
সে জাপটে ধরে আমার শান্তির ঘুম

এ পাহাড় জানে আমার জন্মের কাহিনি
এ পাহাড় জানে আমার প্রিয়তমার নাম
আমার পূর্বপুরুষেরা ঘুমিয়ে আছে এই পর্বতের চূড়ায়।
এখন পাহাড়টা বড়ো অসুস্থ
এই অসুখ অবক্ষয়ের

সভ্যতা ওর বুকের ওপর চেপে বসেছে
নিজেরই ক্ষয়ের জ্বালা পাহাড় সহ্য করছে প্রতিটি মুহূর্তে

আমি তার অসহায় হৃদয়ের ওপর আলতো রাখি আমার হাত
পৃথিবী উপচে পড়ে লাল অশ্রুধারায়।

অনুবাদ ঃ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়।

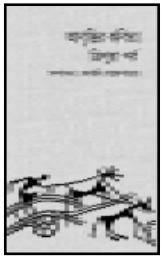
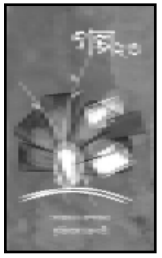

ভাষা

ভাষা-র সমস্ত বইপত্র
ও অন্যান্য প্রকাশনা এখন থেকে বুক ওয়ার্ল্ডে।

পাঠকমাত্রই জানেন, আগরতলা, জগন্নাথ বাড়ি রোডে, বিদুর কর্তা ও আর-এম-এস চৌমুহনী রাস্তার ঠিক মাঝখানে এই বুক ওয়ার্ল্ড। জ্ঞান বিচিত্রার কর্ণধার সুহৃদ শ্রী দেবানন্দ দাম সুদৃশ্য বুক ওয়ার্ল্ড স্টলে **ভাষা**-র জন্য পৃথক গ্রন্থসজ্জার আয়োজন করেছেন। গ্রন্থপ্রিয় মানুষ, যাঁরা এখনো আসতে পারেননি, আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—একবার ঘুরে যান বুক ওয়ার্ল্ডে। আপনার ভালো লাগবেই।

যোগাযোগ ঃ বুক ওয়ার্ল্ড।
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৬১২২৭৯৩। ৯৪৩৬৫৮৬২৫৪। ৯৪৩৬৪৬০৯৩৩।

সময়ের, মননের
ভাষাসাহিত্য